সমবেত
সরস
গল্প
মিহির সেন সম্পাদিত
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন
কলিকাতা—৭০০১৩

প্রথম প্রকাশ ঃ

বৈশাখ ঃ ১৩৬৭

মে ঃ ১৯৬০

প্রকাশক ঃ

প্রসুন কুমার বসু

সমকাল প্রকাশনী

৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,

কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর ঃ

শান্তিরাম দত্ত

মা শীতলা প্রেস

৭০, ডব্লু, সি, ব্যানার্জি স্ট্রী

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট ঃ

গৌতম রায়

প্রচ্ছদ ব্লক ঃ

সি. বি. এইচ. প্রসেস (ক্যালকাটা)

কলকাতা-৭০০০০২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ

নিউ প্রাইমা প্রে

কলকাতা-৭০০০

উৎসর্গ

সরস সাহিত্যের দুই অটুট স্তম্ভ

শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীকে

প্রসঙ্গত

জীবজগতে মানুষের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা বলেছিলেন, মানুষই একমাত্র প্রাণী যার যুক্তিবোধ আছে। দার্শনিক এরিস্টটল এর সঙ্গে আর এক মাত্রা যোগ করে বললেন, মানুষই একমাত্র প্রাণী যে হাসে।

মানুষের বোধহয় আর এক বৈশিষ্ট্য তার কৌতূহল। জীবন ও জগৎ প্রসঙ্গে এক অনন্ত জিজ্ঞাসা। গুরু গম্ভীর পণ্ডিত গবেষকদের হাত থেকে তাই হাসিও নিষ্কৃতি পেল না। হাসিকে তাঁরা জিজ্ঞাসার অনুবীক্ষণের নিচে বসিয়ে খুঁজতে শুরু করলেন, হাসি কি? মানুষ হাসে কেন? কিসে হাসে? হাসির প্রয়োজনীয়তা কি? উপকারিতা কি? হাসির কত রকম প্রকারভেদ আছে?

সাহিত্যের পণ্ডিতরা গবেষণা শুরু করলেন হাস্যরস নিয়ে। বিষয় হাসি হলেও মহাজনদের সেই গুরুগম্ভীর আলোচনার সামনে পড়লে অনেক অভাজনেরই মুখের হাসি উবে যাবে। সুতরাং সে প্রসঙ্গ আপাতত উহ্যই থাক। যেহেতু ফ্রয়েড-বর্নিত হাসি বা হাস্যরসের তেইশ রকমের বৈচিত্র্য বা আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিক শ্রীরূপ গোস্বামীর হাস্যকালীন দন্ত বিকাশের ছয় রকমের শ্রেণী-বিভাগের তত্ত্ব না জানা থাকলেও হাসতে যখন আমাদের মানা নেই। বরং বহু আলোচনায় সবার জানা হয়ে গেছে, হাসি মানুষকে রোগ মুক্ত করে। শুধু তাই নয়, মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত, 'The safety of free world . . . seems to lie in cultivation, not only of courage, moral virtue, but of humor. (william sergant)

স্বভাবতই রসের কারবারী লেখকরাও যে এহেন সর্বজনীন হাসিকে সাহিত্যে রসসৃষ্টির একটি সহজ সরস উপকরণ হিসেবে বেছে নেবেন, সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু কলম খুলেই তাঁরা নিশ্চয় অনুভব করে থাকবেন, যে-মানুষ হাসতে পারে, হাসতে চায়, তাকেও সাহিত্যে হাসানো কী কষ্টসাধ্য প্রয়াস! তার প্রমাণ বিশ্বসাহিত্য। বিশ্বের বিশজন সেরা সাহিত্যিকের নাম জিজ্ঞেস করলে অনেকেই হয়তো এক নিঃশ্বাসে বিশের বেশি নাম বলে দিতে

পারবেন। কিন্তু দশজন সেরা হাসির লেখকের নাম জিজ্ঞেস করলে উডহাউস, লীকক বা মার্ক টোয়েনের পর অনেকেরই পরবর্তী নাম হাতড়াতে হবে। অন্তত জেরোম ক জেরোমের পর তো নিশ্চয়ই। সাহিত্যে লোক হাসানো কঠিন বলেই অনেক কৃতী লেখকও নাম হাসানোর ভয়ে ওপথে পা বাড়ান না।

এ কথা আমাদের বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের আর একটি বাধাও আছে—আমাদের জাতীয়-চরিত্র। বোধহয় অধ্যাপক সুকুমার সেনের বিশ্লেষণই ঠিক,—'জাতি হিসেবে আমাদের মনোভাব হয় ফিলজফিকাল নয় সিনিকাল। এর ফলে আমাদের সাহিত্য বড় সিরিয়াস। আর যেখানে সিরিয়াস নয় সেখানে স্যাটায়ারিকাল। প্রকৃত হিউমার আমাদের সাহিত্যে নিতান্ত দুর্লভ।'

অবশ্য দুর্লভ হলেও চর্চা কোনদিনই থেমে থাকেনি। সেই চর্যাপদের কাল থেকেই হাসির একটি ধারা, কখনও শীর্ণ, কখনও পুষ্ট, আমাদের সাহিত্যে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। তাই এদিনের অনেক পাঠকের যে আতঙ্ক বা অনুশোচনা—শিবরাম চক্রবর্তী বা বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পর বাংলা সাহিত্যে হাসির ধারাটি লুপ্ত হয়ে যাবে—তার সঙ্গে আমি একমত নই। হয়তো সাম্প্রতিক লেখকদের ভেতর নিছক বা একমাত্র হাসির লেখা নিয়ে দু'এক জনের বেশি চর্চা করছেন না, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে অনেকেই এই ধারাটিকে সজীব বা সরস রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বেশ কিছু সিরিয়াস লেখকও সুযোগ সুবিধে মত মাঝেমাঝে হাসির লেখাও লিখছেন। এবং ভালই লিখছেন।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারাটি যে আতঙ্কিত হবার মত অবলুপ্তির পথে নয়, তার নজির তুলে ধরাই এই ক্ষুদ্র সরস সংকলনটির উদ্দেশ্য।

কিন্তু প্রচেষ্টা সীমিত বলেই লেখক নির্বাচনে ব্যাপ্ত কোন কালের—যেমন একশ বছর, পঞ্চাশ বছর, রবীন্দ্রোত্তর বা কল্লোল পরবর্তী—প্রতিনিধিত্ব করার প্রতিশ্রুতিতে দায়বদ্ধ হওয়া সম্ভব হয় নি। বরং বলা চলে, স্বাধীনতা পরবর্তী কালে যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত হয়েছিলেন এবং ১৯২০ সালের পরবর্তীকালে যাঁদের জন্ম—তাঁদের ভেতর এখনও যারা অনলসভাবে অল্প বা বিস্তর লিখে

[illegible]ছেন, তাঁদেরই কয়েকজনের কিছু লেখা নিয়ে এ-সংকলন। প্রকাশকের [illegible] থেকে সংকলনের সম্ভাব্য আয়তন পূর্ব-নির্ধারিত থাকায় আরো কিছু ভাল [illegible] ইচ্ছে থাকা সত্বেও সংকলনের অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হল না। পরবর্তী সংস্করণ (যদি হয়) পরিবর্ধিত হবার সুযোগ পেলে সে সব লেখা গ্রহণ করে আমিও তৃপ্ত হব।

সংকলনের লেখকসূচী লেখকদের বয়সানুক্রমে সাজানো চেষ্টা করা হয়েছে।

সংকলিত লেখকগণ, প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রীগৌতম রায় ও কার্টুন চিত্র শিল্পী শ্রীমান সর্বজিৎ সেনের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি।

পেছনে সমকাল প্রকাশনীর স্নেহভাজন শ্রীপ্রসূন বসুর ক্রমাগত তাড়না না থাকলে সংকলনটি পরিকল্পনার গণ্ডি পেরিয়ে কবে বাস্তবে রূপায়িত হত বলা শক্ত। তখন বিরক্ত হলেও এখন তাকেও আমার সরস অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিরাটী
কলকাতা : ৫১

মিহির সেন

সূচী

রূপোলী সংকট

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

স্বয়ম্ভুবাবুর এমন গোপন ব্যবস্থাটাও ধরা পড়ে গেল। স্ত্রী মনোরমার মুখের দিকে আর তাকাতে পারেন না। চোখাচোখি হলে নিজের মুখখানাই ভস্ম হবার ভয়।

মনোরমার কালো দু'চোখ দু'টুকরো কয়লার মতোই ধক্‌-ধক্‌ করে জ্বলছে। জবাব না পেয়ে আবার তিনি চিৎকার করে উঠলেন, আমি জানতে চাই ও লোকটা ডাক্তার কি না?

ও-দিকের ঘরে মেয়ে মন দিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারির পড়া তৈরি করছিল, আর ছেলে রং পেন্সিল দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ আঁকছিল। দু'জনেরই মনোযোগে ছেদ পড়ল। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকালো এক বার। দিদি ভাইকে ইশারা করল, অর্থাৎ, উঠে দেখে আয় না।

ভাই সভয়ে মাথা নাড়ল, তার দ্বারা হবে না। অগত্যা চেয়ার ছেড়ে সন্তর্পণে উঠে এসে মেয়ে অনু মায়ের ঘরের দরজার আড়াল থেকে

ঝুঁকে মুখ বাড়ালো। ও-দিকে গৃহিণীর সন্ধানে ঠাকুব উঠে আসছিল সিঁড়ি ধরে। কর্ত্রীর তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো কণ্ঠ কানে বিদ্ধ হতে সে ও স্থাণুব মতো দাঁড়িয়ে গেছল। তারপব কখন অগোচবে দিদিমণিব পিছন থেকে গলা বাড়াতে চেষ্টা করছিল নিজেও জানে না।

—তুমি জবাব দেবে না তাহলে ?

—আ-হা বলছি, তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বোস না।

—আমি ঠাণ্ডা হয়ে বসব ! গলার স্বব আবো চড়ল।—নিজে তুমি ঘামছ আর ঠাণ্ডা হবার দবকাব আমাব ? সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র চবণে পাখার বেগুলেটর হাতের এক থাপ্পড়ে ফুল স্পিড ক'রে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দরজার আড়ালে মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি। আর সেই মুহূর্তে দিশেহারা ত্রাসে অনু ঘুরে ছুট দেবাব উপক্রম কবতেই ঠাকুবেব সঙ্গে প্রচণ্ড কলিশন। আচমকা ধাক্কার চোটে ঠাকুব বেচারা মেঝেতে বসে পড়ল। মুখ লাল করে ষোল বছরের মেয়ে অনু চোখের পলকে উধাও।

দু হাত কোমরে তুলে মনোবমা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। সেই মূর্তি দেখে আধ-বয়সী ঠাকুর কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল।

মাথার কাপড়টা খসে যাচ্ছিল, অসহিষ্ণু হাতে মনোরমা সেটা টেনে দিয়ে থমথমে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই ?

—আজ্ঞে জিগেস করতে এলাম······

—জিজ্ঞেস করতে এসে গা ঘেঁসে দিদিমণির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলে কেন ? কি জিজ্ঞেস করতে এসেছিলে ?

—আজ্ঞে রেতে বাবুর জন্য আর কিছু রান্না করতে হবে কি না··

—হবে। আমার মাথাটা কেটেকুটে বেশ করে বাবুকে রান্না করে দিতে হবে। বুঝেছ ?

মাথা নেড়ে পুরনো ঠাকুর প্রাণের দায়ে নিচে ছুটল। জ্বলন্ত চোখে মনোরমা স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। আঁচলটা আবার মাথা থেকে খসে যাবার উপক্রম হতে তেমনি অসহিষ্ণু হাতে আবার টেনে দিলেন তিনি। আজকাল কপালের ওপর দিকটা ঘেঁসে মাথায় কাপড় দেবার বাইটাও লক্ষ্য করছেন স্বয়ম্ভু চৌধুরী।···স্ত্রী যখনই কোমরের নিচ পর্যন্ত একপিঠ চুল খুলে দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাতে চিরুনি চালাত—ওদিকের বাড়ির বছর চল্লিশেকের একটা লোক গুটি গুটি তার বারান্দায় এসে দাঁড়াত এবং হাঁ করে চেয়ে থাকত। স্বয়ম্ভুবাবু দিন দুই এ নিয়ে ঠাট্টা করার পরেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেশ-বিন্যাস তো বন্ধ হলই, তার ওপর মাথায় কাপড উঠল। সেই ঠাট্টার দরুন স্বয়ম্ভুবাবু মনে মনে অনুতপ্ত। চিরুনি হাতে চুলের বোঝা বিন্যস্ত করার চেষ্টায় মনোরমার শরীরটা পিছন দিকে একটু বেঁকে বেঁকে যেত।······শুধু ও-বাড়ির হ্যাংলা লোকটা নয়, স্বয়ম্ভুবাবু নিজেও তখন মুগ্ধচোখেই চেয়ে দেখতেন।

······সেই দৃশ্য ছ'মাস হয়ে গেল আর দেখেন না। স্ত্রীটি তাঁর শৌখিন, প্রসাধন-পটু এবং প্রসাধনের সমজদার। এখন চুল আঁচড়ানো ছেড়ে আধঘণ্টার প্রসাধনপর্বও বাথরুমেই সেরে আসেন। অবশ্য আয়না টায়না ফিট্ করা সেই রকমই আধুনিক বাথরুম তাঁর। কিছু বললে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, ছেলেমেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, যা করা উচিত তাই করছি—তুমিও আর কচি খোকাটি হয়ে না থেকে ওদের বাপের মতোই চলাফেরা করো।

দুই চোখে সামনের মানুষটার মুখখানা ভস্ম করতে চেষ্টা করে মনোরমা আবার ঝলসে উঠলেন, কি, তুমি জবাব দেবে না?

মুখ কাঁচু-মাচু করে স্বয়ম্ভুবাবু বললেন, ডাক্তারই—ইয়ে ডাক্তার কি বন্ধু হতে নেই নাকি!

মনোরমা চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি তোমার একটাও বাড়তি কথা শুনতে চাই না, যা জিজ্ঞেস করছি জবাব দাও—কিসের ডাক্তার ওই লোকটা, পাগলেব ডাক্তাব?

স্বয়ম্ভুবাবু প্রমাদ গুণলেন। জবাব দিলেন, ও-ভাবে বলছ কেন—বিলেত-ফেরত মস্ত ডাক্তার, যে কোনো-কাবণে মানসিক অশান্তি হলে ওঁরা সাহায্য কবতে পাবেন···

রাগে চোখে-মুখে আগুন ঠিকরোচ্ছে মনোরমার।—মানসিক অশান্তির জন্য তুমি পাগলেব ডাক্তাব এনে হাজিব করেছ! তলায় তলায় পাগলেব চিকিৎসা কবাচ্ছ? এই জন্যেই রাত দিন ঘুম পায় আমার!

—আহা, মনো তুমি বুঝছ না ····

—আমি বুঝছি না? লোকেব কাছে আমাকে তুমি পাগল বানাতে চাও, আমি বুঝছি না? এত সাহস তোমার! সবাই তোমাকে কচি কচি বলে, স্ত্রীকে পাগল বানিয়ে বাতিল করতে পারলে আবার একটা বিয়ে থাওয়া কবাব সুবিধে হবে, কেমন?

—আঃ! মনো, ছেলে-মেয়ে শুনতে পাবে।

রাগে কাঁপছেন মনোবমা। চাপা স্ববে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, শুনুক, তোমার স্বভাব-চবিত্র বিয়েব আগে থেকেই আমার জানা আছে।

স্বয়ম্ভুবাবু ক্রুদ্ধ স্ত্রীটির মুখের ওপব বলতে পারলেন না বিয়ের আগে থেকে বা পরে থেকে তাঁর চরিত্র খারাপের যতটুকু নজির তাঁর স্ত্রীর হাতে আছে (অবশ্য অনেক আছে), তার সবটুকুর সঙ্গেই মনোরমা নামে একটি মেয়ে ভিন্ন দুনিয়ার আর কোনো রমণীই যুক্ত নয়। আর স্বভাব-

চরিত্রের এখনো। যে সঙ্গোপন বেচাল ধরা পড়ে তাও এই স্ত্রীটিকেই কেন্দ্র করে।

কিন্তু আপাতত এই রসিকতা করার দুঃসাহস নেই স্বয়ম্ভুবাবুর। রণে ভঙ্গ দিয়ে তিনি সোজা নিচে পালিয়ে এলেন।

ছ'মাস হল বাড়িব হাওয়া একেবারে বদলে গেছে। যেখানে কারণে অকারণে খুশির ছড়াছড়ি সেখানে দিন-রাত থমথমে গুমোট একটা। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন বাড়ির কর্ত্রীব মেজাজ চড়া। আর তারপর থেকে সেই মেজাজ একটু একটু করে এমনই চড়তে লাগল যে বাড়ির সব ক'টি প্রাণী সচকিত। ছেলে-মেয়ে সন্ত্রস্ত মা কখন তাদের ওপর ফেটে পড়ে। ছোকরা চাকর শামুটা হাড় পাজী—কর্ত্রীর মুখের ওপর দিনকে বাত করতে ওস্তাদ। সে এখন কর্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতেও সাহস করে না। আর সব থেকে অবস্থা কাহিল বাড়ির কর্তাটির। মনোরমার সব রাগ যেন তাঁরই ওপর। তাঁকে দেখলে ঝলসে ওঠেন, না দেখলে আরো বেশী। স্বয়ম্ভু চৌধুরী আকাশ-পাতাল খুঁড়েও ভেবে পাচ্ছেন না কি হয়েছে বা কি হতে পারে। অনেক বার জিজ্ঞাসা করেছেন, ফল বিপরীত হয়েছে। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ভরসা করে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না তিনি। গোপনে এক মানসিক চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে বন্ধু পরিচয় দিয়ে তাঁকে বাড়ি এনে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সে-ভদ্রলোক এখনো ভাল করে চিকিৎসা শুরু করারই অবকাশ পান নি। সবে স্নায়ু ঠাণ্ডা রাখার কিছু ওষুধ দিয়েছিলেন। দু'বেলা চায়ের সঙ্গে আর কফি মেশানো দুধের সঙ্গে স্বয়ম্ভুবাবু সেই সব বড়ি গুলে নিজের হাতে স্ত্রীকে আদর করে খাওয়াচ্ছিলেন।

তাও ধরা পড়ে গেল।

'......প্রেসক্রপশনটা হাত-কাটা কোর্তার ভিতরের পকেটে রেখে-ছিলেন তিনি। খুচরো পয়সার দরকার পড়তে সেই পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলেন মনোরমা। পয়সার বদলে হাতে মানসিক চিকিৎসকের ছাপানো প্যাডেব কাগজে লেখা মনোরমা দেবীর নামেব প্রেসক্রপশন দেখে প্রথমে হতভম্ব তিনি। তাবপর এই তাণ্ডব।

মনোরমার বয়েস এখন সাঁইতিরিশ। মেয়ে সামনে না থাকলে এখনো বত্রিশ তেত্রিশ বলে চালানো যায়। মেয়েটা যে ষোল না হতেই ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধবেছে সেটা তাঁর খুব মনঃপূত ছিল না। কিন্তু মেয়ের বাড়ন্ত গড়ন স্কুল থেকে এসে প্রায়ই বলত, আর ফ্রক পরতে ভালো লাগে না, টিচাররা পর্যন্ত হাসে। টিচাররা হাসে শুনে মনোরমা চটেছেন, কিন্তু ফ্রক পরলে মেয়েকে যে আব মানায় না সেটা নিজেও অস্বীকার করতে পারেন না।

শাড়ি ধরার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে যেন হঠাৎ মস্ত বড় হয়ে গেল। সেও তাঁর চোখে খুব ভালো লাগে নি। মেয়ে অনু বাপের মুখের ছাঁদ পেয়েছে কিন্তু শরীরের গড়ন মায়ের মতো পরিপুষ্ট। ওদিকে ওর থেকে চার বছরের ছোট বিনুর মুখেব ছাঁদ মায়ের মতো, কিন্তু শরীরের ধাঁচ বাপের মতো ছিপছিপে, পাতলা। ভাই-বোনের দেহ-সৌষ্ঠব উল্টো হলে মনোরমা খুব অখুশি হতেন না।

মা এবং মেয়ের পরিপাটি সাজ-সজ্জার ওপর বেশ একটা প্রীতি আছে। মনোরমার বরাবরই ছিল। সাজতে গুজতে ভালোবাসতেন ; শুধু তাই নয়, দেহ-সৌষ্ঠব বেশ আঁটোসাটো রাখার দিকেও গোপন প্রয়াস ছিল একটু। ছেলে মেয়ে দুটো হবার পর শরীরের বাঁধুনি ঢিলে-ঢালা হয়ে না যায় সেদিকেও প্রখর দৃষ্টি ছিল। বিনু হবার পর

স্বামীকে স্পষ্ট নোটিস দিয়েছেন, আর নয়, এই ছুটোই বেঁচে বর্তে থাক।

স্বয়ম্ভুবাবু গোবেচারার মতো বলেছিলেন, আমি তাহলে যাই কোথায়!

মনোরমা সুচারু মুখঝামটা দিয়েছেন, কোথাও আর গিয়ে কাজ নেই—কেন, আজকালকার দিনে ব্যবস্থার কিছু অভাব আছে না!কি!

সাজ-সজ্জা আর দেহ-চর্চার প্রতি মনোরমার স্বাভাবিক আকর্ষণ তো আছেই, তা ছাড়াও এর আরো একটু কারণ আছে। পুরুষ মানুষগুলোকে তিনি খুব বিশ্বাস করেন না। তাঁর ঘরের এই পুরুষটিকে তো আদৌ বিশ্বাস করেন না। তাঁর অনেক লোলুপ অনাচারের সাক্ষী তিনি নিজেই। এর ওপর একজনের জীবনের একটা ঘটনা মনের ওপর বেশ ছাপ রেখে গেছে। স্কুল-কলেজে মনোরমার একটি প্রিয় বান্ধবী ছিল। সুগতা। খুব ভালো ছাত্রী ছিল সুগতা, ম্যাট্রিকে মেয়েদের মধ্যে স্কলারশিপ পেয়েছিল। বি-এ পড়তে পড়তে তার এক স্কলার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। মনোরমার ধারণা ছিল, ছুই স্কলারে মিলে স্বর্গরাজ্য রচনা করবে। সুগতার চেহারা ভালো ছিল না, রোগা ছিল, তার ওপর প্রায়ই অসুখে ভুগত। পাঁচ বছর না যেতে দেখা গেল ওর বর অন্য বান্ধবী জুটিয়ে দিব্যি ফুর্তিতে আছে। আর ছু'বছর যেতে আত্মহত্যাই করে বসল মেয়েটা। সেই সুগতা একদিন মনোরমাকে বলেছিল, স্বাস্থ্য আর চেহারাপত্রর দিকে নজর দিস, পুরুষের চোখে ওটাই আসল জিনিস।

সুগতার বাক্য মনোরমার কাছে বেদবাক্য।

স্বয়ম্ভুবাবুর বয়েস এখন তেতাল্লিশ। কিন্তু সেটা বিশ্বাস করতে হলে ঠিকুজি-কুষ্ঠি বার করতে হবে। দেখলে টেনে-টুনে, বড়জোর

তেত্রিশ বলা যায়। তাঁর নামটাই যা ভারিক্কি, আর কোনো ব্যাপারে ভারি কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। শেভ-টেভ করলে একেবারে কচি চেহারা। বড় চাকরি করেন। কিন্তু তাঁর অধস্তন অফিসারদের সকলেরই অনেক বেশী জাঁদরেল মূর্তি তাঁর থেকে।

বয়েসকালে প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। একই বাড়িব ওপর নীচের বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা। প্রেম নয়, প্রেমের বন্যা। স্বয়ম্ভুবাবু থাকে বলে একেবারে অন্ধেব মতো আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রেমের সেই দুর্বার বেগ মনোবমা ঠেকাতে পাবেন নি। অবিশ্বাসের মানুষ হলে মনোরমাকে বিয়েব আগেই আত্মহত্যা করতে হত। কি যে ত্রাসে কেটেছিল কিছু দিন, তিনিই জানেন। তারপর থেকে এই ছ'মাস আগে পর্যন্তও মনে কবতে পাবার মতো অশান্তি কিছু হয় নি।

এর মধ্যে স্ত্রীব হঠাৎ এই মানসিক অবস্থা। স্বয়ম্ভুবাবুর মাথা খুঁড়ে কারণ খোঁজাবই কথা। উঠতে বসতে মনোরমার এমন রাগ, এই মেজাজ, আর শুকানো খরখরে মুখ দেখে তিনি বিমর্ষ বিচলিত।

·· মাস চারেক আগেব কথা। তখনো মেজাজের এতটা বাড়াবাড়ি শুরু হয় নি। তবে বেশ ব্যতিক্রম বোঝা যাচ্ছিল। তিন-চার দিনের জন্য স্বয়ম্ভুবাবুর ছোট শালী কানপুব থেকে বেড়াতে এসেছিল। যাবার আগের রাত্রিতে সে কথায় কথায় ঠাট্টা করেছিল, জামাইবাবু, চেহারাখানা যা রেখেছ, এখনো তো দিব্যি আর একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া যায়।

স্বয়ম্ভুবাবু ফিরে রসিকতা করেছিলেন, সবই তোমার দিদির হাতযশ, আমার কোনো কেরামতি নেই।

স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তে দেখেন থমথমে মুখ তাঁর।

পরদিন বিকেলে বারান্দার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে

দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ম্ভুবাবু। কিছুই দেখছিলেন না। হঠাৎ পাশ থেকে' মনোরমার হিসহিস চাপা ভর্ৎসনা কানে আসতে সচকিত।—শালী চেহারা কাঁচা বলে গেল বলে এখনো হ্যাংলার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার মেয়ে দেখার বয়স আছে নাকি? ওদিকে নিজের মেয়ের বয়েস হয়েছে সে খেয়ালও নেই! লজ্জাও করে না!

স্বয়ম্ভুবাবু বিমূঢ়। রাস্তা দিয়ে তখন সত্যিই কয়েকটি অল্পবয়সী মেয়ে যাচ্ছিল। সভয়ে চেয়ে দেখেন মনোরমার চোখ-মুখ যেন জ্বলছে।

ছ'মাস হয়ে গেল কারণে অকারণে এই জ্বলুনি বেড়েই চলেছে। এমন বাড়া বেড়েছে যে তাঁকে গোপনে মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।

হঠাৎ দিন দশেকের একটা শক্ত জ্বরে পড়ে গেলেন স্বয়ম্ভুবাবু। জ্বর ছাড়ছেই না দেখে বড় ডাক্তার পর্যন্ত আনতে হয়েছিল। জ্বরটা ছাড়ার পরেও দুর্বল।

মনোরমা গম্ভীর মুখেই সেবা-শুশ্রূষা করে চলেছেন। সেদিনও বসে ক'দিনের তেল-না-পড়া লালচে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তিনি। হঠাৎ কি দেখে দু'চোখ উদ্ভাসিত তাঁর। বলে উঠলেন, ও মা! এ দেখি একটা পাকাচুল, নোড়ো না, নোড়ো না···

ঝুঁকে অস্বাভাবিক আগ্রহে স্বামীর মাথার পাকা চুলটা বেছে তুললেন তিনি। তারপর সেটা সামনে ধরলেন। স্বয়ম্ভুবাবু অবাক প্রথম। স্ত্রীর চোখে-মুখে চাপা আনন্দ যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

—দেখি আর আছে কিনা! তেমনি আগ্রহে আর উদ্দীপনায় আবার মাথার ওপর ঝুঁকলেন তিনি। একটু বাদেই আবার অস্ফুট আনন্দধ্বনি।—এই তো দেখি আর একটা! বেছে তুললেন সেটাও।

—তবে যে বড় কাঁচা সেজে বেড়াও। দাঁড়াও দেখি আরো আছে কিনা

স্ত্রীর এমন হাস্যোদ্ভাসিত মুখ স্বয়ম্ভুবাবু ছ'মাসের মধ্যে আর দেখেন নি। তিনি আশা করতে লাগলেন আরো যেন অনেক পাকা চুল বেরোয় তাঁর মাথা থেকে।

আরো গোটা দুই বেরুলো। আর সেই সঙ্গে মনোরমার চেহারাই যেন বদলে যেতে লাগল। ছেলের স্কুল থেকে ফেরার সাড়া পেয়ে পাকা চুল খোঁজার আনন্দে ছেদ পড়ল।

সেই বিকেল সেই সন্ধ্যায় সেই রাত্রিতে ছেলেমেয়ে ঠাকুর চাকর পর্যন্ত অবাক। একটানা দীর্ঘ দিনের একটা অনড় দুর্যোগ হঠাৎ জাদুমন্ত্রে কেটে গেছে যেন। একজনের আনন্দের ছোঁয়ায় বাড়ির এতদিনের গুমোট এক মুহূর্তে হাল্‌কা হয়ে গেছে।

স্ত্রী যা-ই ভাবুন, স্বয়ম্ভুবাবু বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি নতুন করে কিছু বিশ্লেষণ-মগ্ন হয়েছেন। যথা, তাঁর মাথায় পাকা চুল দেখার পর এ-রকম-হাওয়া বদল হয়ে গেল কেন? স্ত্রী ছ'মাস ধরে মাথায় শাড়ির আঁচল চাপাচ্ছে কেন? প্রসাধন আর কেশবিন্যাস আজকাল বাথরুমে সম্পন্ন হয় কেন? ড্রেসিং টেবিলের দেরাজে ছ'মাস ধরেই চাবি-বন্ধ থাকছে কেন?

সকালে বাজার এলে ঘণ্টা দুই নিচে থাকেন মনোরমা। গা-আলমারির ওপরের তাকে তাঁর চাবি থাকে। সেই সময়ে চট করে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ খুললেন স্বয়ম্ভুবাবু। দেরাজে সারি সারি তেলের শিশি—সব ক'টার গায়ে চুল তাজা আর কাঁচা রাখার বিজ্ঞাপন।

...রাত্রি গভীর। স্বয়ম্ভুবাবু নিঃশব্দে উঠে ঘরের আলো জ্বাললেন। ঘুমন্ত মনোরমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালেন। না, মাথায় এখন

কাপড় নেই। স্বয়ম্ভুবাবু ঝুঁকে দেখলেন। চুলের ফাঁকে ফাঁকে রুপোলী রেখা।

পর দিন।

স্বয়ম্ভুবাবুর আরো দিন তিনেক ছুটি আছে। বেলা দুটো-আড়াইটে নাগাত মনোরমা অনেক দিন বাদে পাশের বাড়ির দিদির ঘরে গল্প করতে গেছে। আগে রোজই আড্ডা বসত।

স্বয়ম্ভুবাবু সেই অবকাশে ছোকরা চাকর শামুকে ডাকলেন। বললেন, পাকা চুল বাছ—এক-একটা তুললে চার পয়সা।

ওকে হাড়ে হাড়ে চেনেন স্বয়ম্ভুবাবু। তিনি একটু বাদে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলেন, শামু পাকা চুল বাছতে লাগল। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আঁতি-পাতি করে খুঁজে দুটো পেল কিনা সন্দেহ।

এক ঘণ্টা বাদে ঘুম ভাঙার মতো করে হাই তুললেন স্বয়ম্ভুবাবু।—সেই থেকে তো পট্‌পট্‌ করে তুলে চলেছিস. দেখি ক'টা হল ?

সুযোগ পেয়ে চোখ-কান বুজে শামু বলল, সতেরোটা।

ওর গালে একটা চড় বসাতে ইচ্ছে করল স্বয়ম্ভুবাবুর। কিন্তু হাসি-মুখেই বললেন, তোর মা-কে ফিরতে দেখলে আমাকে খবর দিস তো, আর তখনই পয়সা নিয়ে যাস।

একটু বাদেই শামু এসে খবর দিল মা আসছেন। স্বয়ম্ভুবাবু ধীরে সুস্থে ব্যাগ খুলে পয়সা বার করতে লাগলেন। ইত্যবসরে মনোরমা ঘরে ঢুকলেন। আর তখনি স্বয়ম্ভুবাবু এক টাকা এক আনা শামুর হাতে দিলেন।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের পয়সা ?

মুখ কাঁচু-মাচু করে স্বয়ম্ভুবাবু জবাব দিলেন, ও সতেরোটা পাকা চুল তুলেছে মাথা থেকে, প্রত্যেকটার জন্য এক আনা করে দেব বলেছিলাম।

—সতেরোটা! বিস্ময় আর আনন্দে দু'চোখ কপালে তুলে ফেললেন মনোরমা।—কই দেখি, দেখি?

শামু জবাব দিল, ফেলে দিয়েছি তো। কর্ত্রী এত খুশি হবে জানলে সে হয়তো চৌত্রিশটাই বলে বসত।

পরদিন বিকেলের দিকে চুপচাপ একটু বেরিয়ে পড়লেন স্বয়ম্ভুবাবু। তাঁর চেনা বড় একটা স্টেশনারি দোকানে ঢুকলেন। দোকানের মালিককে একপাশে ডেকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন, চুল একটু সাদা করার মতো লোশন-টোশন কিছু আছে?

মালিক অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

স্বয়ম্ভুবাবু আবার বললেন, মানে—পাকা চুল কালো করার যেমন কলপ আছে, তেমনি কাঁচা চুল একটু-আধটু পাকা দেখাবার মতো কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম...

দোকানের মালিক তবু হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দিলেন, ঠিক বুঝলাম না।

স্বয়ম্ভুবাবু প্রথমে বিরক্ত এবং পরে বিমর্ষ মুখে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন।

ছেলের ম্যাও বাবার হ্যাপা

সমরেশ বসু

'না, এ ভাবে তোমাকে আমি চুপ করে থাকতে দেব না।'

গায়ত্রীর স্বরে রীতিমতো ঝাঁজ, মুখে ক্ষুব্ধ উত্তেজনার অভিব্যক্তি। খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, তিনি আবার বললেন, 'ব্যাপারটাকে তুমি গায়ে মাখছো না, কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না। যেখানেই যাই, এক কথা। বাড়িতে যে আসে সেও একই কথা। জিজ্ঞেস করে, আর বলে, 'চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে গেছে, আমি আর কান পাততে পারি না।'

প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে, গায়ত্রী দম নেবার জন্য থামলেন। মাধবের ফর্কে গাঁথা ডিম পোচের টুকরো, প্রায় মুখের কাছে, কিন্তু মুখে তোলার অবকাশ পাচ্ছেন না, অর্দ্ধেক হাঁ করে গায়ত্রীর কথা শুনছিলেন। গায়ত্রীর কথা থামতেই তিনি পোচের টুকরো মুখের মধ্যে পুরে চিবোতে চিবোতে বল:লন, 'কিন্তু আসলে ব্যাপারটা—'

'আসল নকল জানি না।' গায়ত্রী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,

'যে লোক জেগে ঘুমোয়, তাকে জাগানো শিবের বাবারও কম্মো নয়। এ কথা তুমি বলতে পারবে না যে, তুমি কিছু জানো না, তোমাকে কিছু জানানো হয় নি। ব্যাপার তোমার সবই জানা।'

মাধব বুক খোলা পাঞ্জাবীটার হাতা গুটিয়ে, বাটার টোস্ট হাতে নিয়ে, কামড় বসাবার আগে বললেন, 'সবই জানা মানেটা কী? আমি কী করে সব জানবো? আমার মনে হয়, তুমিও সব জানো না।'

বলে, অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবেই টোস্টে কামড় বসালেন। গায়ত্রী অর্থাৎ মাধবের স্ত্রী যতোটা উত্তেজিত, এবং ওঁর স্বর যতোটা উচ্চ, তুলনায় মাধব অনেকখানি শান্ত, এবং তাঁর গলার স্বর যথেষ্ট অবিচলিত ও নরম। গায়ত্রী ঝাঁজে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

ওঁর চোখে এখন রীতিমতো একটা কুটিল সন্দেহ। এখনো চল্লিশে পৌঁছোন নি, পৌঁছোব-পৌঁছোব করছেন। চুল এখনো কৃষ্ণ কালো এবং ঘন। সিঁথি একটু চওড়া হয়ে গিয়েছে, দীর্ঘকাল এক ভাবে আঁচড়ে এবং সিঁদুর লাগিয়ে। দাঁত সব ক'টি অটুট, এবং শরীরে কিছু মেদের ঢল নামলেও, স্বাস্থ্য খারাপ না। সংসারে কারুর যৌবনই থির বিজুরি না, গায়ত্রীরও যৌবনের সেই ঔজ্জ্বল্য নেই, কিন্তু একটা ঝলক থাকে। তা প্রখর কিরণ না হোক, একটা লাবণ্য থাকে। গায়ত্রীর এখন সেইরকম দেহসৌষ্ঠব। চোখ নাক খুব ভালো, একটা ব্যক্তিত্বের ছাপও আছে।

মাধব সেই তুলনায় চুলটা বেশ পাকিয়ে ফেলেছেন। দাঁত দৃষ্টি দেহ অবিশ্যি অটুট রেখেছেন। কিছু মেদ সঞ্চয় করেছেন, জায়গা বিশেষে অর্থাৎ পেটের দিকে। সেটাও দাঁড়ালে বা চলাফেরা করলে, তেমন বোঝা যায় না। বয়স পঁয়তাল্লিশ। একটা বিদেশী বাণিজ্য সংস্থার, তেমন একটা কেষ্ট বিষ্টুর পদ না হলেও, পদটি দেব ভাগ্যের

যতোই। আয়করের রাহুর গ্রাসে যা দেবার, দিয়েও মাসে হাজার তিনেক বেতন পান. কোম্পানির গাড়িও পেয়েছেন। তিনি দাঁতে জিভে টোস্টের টুকরো সামলাতে সামলাতে বললেন, 'মানে ওরা কী করে, তা কি আমাদের পক্ষে সব জানা সম্ভব? আমরা কি আর দেখতে যাচ্ছি. ওরা কখন কোথায় কী করছে না করছে?'

গায়ত্রীর স্বর আরো তীব্র এবং ঝাঁজালো হলো, বললেন, 'সে কথা হচ্ছে না ওরা কি করে না করে। জীবনে যেন আমাকে তা কোনো দিন দেখতেও না হয়, তার আগেই যেন আমি চোখ বুজি।'

তাঁর স্বরে বাষ্পের একটু ভ্যাপসানি টের পাওয়া গেল। মাধব ফর্ক শুদ্ধ হাত নেড়ে সান্ত্বনার স্বরে বললেন, 'আহা অমন করে বলো না। ভবিষ্যতে কি হয় না হয়, কিছুই বলা যায় না, এখন থেকেই চোখ বোজাবুজির কথা আসছে কেন। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে হবে— মানে যাতে ঠিক মতো ব্যবস্থা করা যায়।'

গায়ত্রী এর মধ্যে গলার বাষ্পটুকু সামলে নিয়েছেন, অভিযোগের সুরে বললেন, 'সে তো তুমি অনেক দিন ধরেই করছো। এতদিন ধরে যে বারে বারে বলে আসছি. তুমি একবারও ছেলেকে ডেকে শাসন করেছ? এক ফোঁটা ছেলে. নাক টিপলে দুধ বেরোয়, সবে কলেজের গণ্ডি ছাড়িয়েছে, সে এইবার কেচ্ছা কেলেংকারি করে বেড়াবে, আর তা সইতে হবে? তার মানে, তুমিও ছেলেকে আজকালকার এইসব মড ছোকরার চোখে ছাখো, তা না হলে চুপ করে থাকার মানে কী?'

মাধব গায়ত্রীর কথার ফাঁকে একটু ডিম পোচ খেয়ে নিয়েছেন। একটু হাসলেও, তার মধ্যে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললেন, 'আহা, খুকু (ডাক নাম) শোন, তোমার ছেলে অনার্স নিয়ে বি. এসসি. পাশ করেছে। যতোই দুধ খাইয়ে থাকো, নাক টিপলে তা আর এখন বেরোবে না।

শাস্ত্রে বলে, ষোড়শ বর্ষেই ছেলে সাবালক, সে তখন বাবা মায়ের সন্তানও যেমন, বন্ধুস্থানীয়ও বটে।'

'তবে আর কী, ছেলেকে নিয়ে এখন বাবা ছেলে মুখোমুখি বসে সিগারেট খাও। আরও যদি কিছু থাকে, তাও করো।' গায়ত্রী বিদ্রূপে ঝাঁজলেন, এবং আবার বললেন, 'কিন্তু দোহাই, আমাকে বাদ দাও, আমি তোমাদের মধ্যে থাকতে চাই না।'

গায়ত্রী সরে যাবার উদ্যোগ করতেই মাধব তাঁর একটি হাত টেনে ধরলেন, বললেন, 'শোন শোন, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো। তোমার ছেলে মড ছোকরা না, রকবাজ টকবাজও না, আমি তা ভাবতে যাবো কেন। আমি চুপ করে থাকি বলে কি সেটা ছেলের প্রতি অবহেলা? মোটেই তা না। কাজকর্মে কি রকম ব্যস্ত থাকে, দেখেছ তো? তেমন খেয়াল থাকে না।'

গায়ত্রী যেন একটু ঠাণ্ডা হলেন, বললেন, 'খেয়াল না করলে কি চলবে?'

'তা কেমন করে চলবে।' মাধব বললেন, 'নিশ্চয়ই খেয়াল করতে হবে। আমার ছেলে, আমি খেয়াল করবো না? আসলে, ব্যাপারটা বেশ গুরুতর, ধরতে পারি নি। আচ্ছা? মেয়েটা কে বলোতো? কার মেয়ে, কোথায় থাকে? আমাদের চেনা শোনা?'

গায়ত্রী বললেন, 'তোমাকে অনেকবার বলেছি, তুমি কান দাও নি। মেয়েটা থাকে বড় রাস্তায় ট্রাম লাইনের ওপারে। পাকা ঝিকুটি মেয়ে।'

মাধব ইতিমধ্যে খেতে আরম্ভ করেছেন, এবং খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি চেনো নাকি? মানে আলাপ আছে?'

গায়ত্রী বললেন, 'আলাপ-টালাপ নেই, তবে চিনি।'

'কি নাম ? পড়াশোনা করে ?'

'শুনেছি এ বছর হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। নাম বন্যা।'

'বন্যা ?' মাধব ডিম চিবোতে চিবোতে যেন বিষম খেয়ে বললেন, 'বাবা ! নাম শুনলেই মনে হয়, বোঝা যাবে তো ?'

গায়ত্রী ভ্রুকুটি চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বোঝা যাবে মানে ?'

মাধব হেসে বললেন, 'নাম বন্যা বললে কেন, তাই বলছি। তা কার মেয়ে জানো টানো ? মানে ভদ্রলোকের মেয়ে তো, না কি ?'

গায়ত্রী বললেন, 'ভদ্রলোক কি ছোটলোক জানি না। শুনেছি চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট, ইনকাম ট্যাক্স ল-ইয়ার, নিজের অফিস-টফিস গাড়ি-ঘোড়া আছে। তা থাকুক গে, যাদের মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, তাদের আমি ভদ্রলোক বলি না।'

'সেটা আর বাবা কি করবে, কিন্তু—।'

গায়ত্রী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'বাবা কি করবে মানে ? বাবা মা মেয়েকে শাসন করবে না ? খবর রাখবে না, মেয়ে কি করে বেড়াচ্ছে ?'

মাধব শান্ত ভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'তা রাখবে কিন্তু কতোটা বলো। তাদের তো কাজকর্ম সংসার আছে। যেমন তোমার বা আমার। আমরাই বা আমাদের মেয়ে লীলার জন্য কি করতে পেরেছিলাম ? সেই তো অভিজিৎকে বিয়েই করলো, আমরাও হেসে-খেলে বিয়ে দিলাম। কে জানতো আমাদের মেয়ে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে ?'

'চুপ করো !' গায়ত্রী প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ছেলেমেয়েদের বিষয়ে কথা বলবার সময় ভাষাটা একটু মার্জিত করো।'

মাধব বললেন, 'ওহ্, তাও তো বটে, ডুবে জল খাওয়া কথাটা—থাকগে, এখন যে কথা হচ্ছিল। লোকটা সি. এ. 'ল' ইয়ার, তার মানে নিশ্চয়ই চশমখোর। এত কাছাকাছি থাকে, নামটা জানি না?'

গায়ত্রী বললেন, 'অশনি মিত্তির।'

'কায়েত?' মাধবকে যেন আচমকা ঘুম থেকে ঠেলে জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গায়ত্রী বললেন, 'তবে আর তুমি শুনছো কি!'

মাধব প্রায় এক মিনিট নিঃশব্দে চা পান করলেন, তারপরে বললেন, 'এতে অবিশ্যি আজকাল কিছুই এসে যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, বামুনের গোয়ালেই গরু আজকাল বেশি। তার থেকে অনেক কায়েত অনেক বেশি ভালো।'

গায়ত্রী রুষ্টস্বরে বললেন, 'সে সব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার কী। আমরা তো আর আত্মীয়তা করতে যাচ্ছি না।'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই।' মাধব পায়জামা পরা পায়ের ওপর পা তুলে সিগারেট ধরালেন, এবং বেশ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা খুকু, আমাদের শামু আর—কী বললে নামটা—বান—না, বন্যা, হ্যাঁ, কী করে ওরা বলো তো? ঠিক কী শোনা যায় ওদের নামে?'

গায়ত্রী বললেন, 'কী আবার? মেয়েটার সঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রেস্টুরেন্টে সিনেমায় পার্কে ময়দানে। আমার দাদা সেদিন দেখেছেন, লেকের কাছে তোমার ছেলে, মেয়েটার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর সিগারেট টানছে।'

মাধব বললেন, 'শামু বোধ হয় জানতো না, ওর মামা সে সময়ে লেকে যাবে, তা হলে অন্তত: মেয়েটার হাত ধরতো না, সিগারে খেতো না।'

'জানি না।' অসীম বিরক্তির ঝাঁজে গায়ত্রী বললেন, 'আমি তো দাদাকে বললাম, 'ধরে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিলে না কেন?'

মাধব হেসে বললেন, 'তা কী করে সম্ভব, তা তো সম্ভব না। গায়ে হাত তোলা কি এতোই সহজ, তাও আবার পাবলিকলি? বাবা হয়ে আমিই পারতুম না, তায় আবার মামা।'

গায়ত্রীর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হলো, বললেন, 'কেন, বাবা মামা মারতে পারে না?'

'পারবে না কেন, মারবার একটা বয়স আর স্থান-কাল আছে তো।' মাধব বলেই তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে পিছলে চলে গেলেন, 'থাক গিয়ে, ব্যাপারটা বুঝেছি আমি আর, ব্যাপারটা আমার মোটেই ঠিক লাগছে না। সে কোথায়, শামু?'

বলতে বলতে মাধবের মুখ রীতিমতো গম্ভীর হয়ে উঠলো। গায়ত্রীও যেন একটু সন্ত্রস্তই হলেন। বললেন, 'এই তো একটু আগে বাড়িতে এসেছে, বোধ হয় পড়ছে-টড়ছে কিছু।'

'হুঁম!' মাধবের মুখ আরো গম্ভীর এবং চিন্তিত দেখাচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এখন প্রায় আটটার সময়, মাধব সন্ধ্যাকালীন জলযোগ করলেন, রাত্রের খাবার খেতে প্রায় বারোটা। এসময়ে সাধারণত বাইরে বা বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেন, বা পার্টি-টার্টি থাকলে যান। তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পিছন থেকে গায়ত্রী বললেন, 'তোমার অল্প কথাতেই কাজ হবে, বেশি কিছু বলো না। রাগারাগি করো না। তোমার প্রেসারটা আবার বাড়বে।'

'হুম!' শব্দ করে, মাধব খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। গায়ত্রী সঙ্গে যাবেন ভাবলেন, কিন্তু গেলেন না, রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

মাধব এলেন শামুর ঘরের দরজায়, ডাকলেন, 'শামু আছিস ?'

শামুর প্রায় চমকানো স্বর শোনা গেল, 'কে বাবা ? আছি।' বলতে বলতে দরজার সামনে এলো। শামু বাবা মেশানো চেহারা পেয়েছে। ঠিক কোমল বলা যাবে না, ইতিমধ্যে যেন যৌবনের প্রখরতা আর গাম্ভীর্য এসে গিয়েছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি গভীর এবং কোমল। জিজ্ঞেস করলো, 'কী বলছো বাবা ?'

মাধব গম্ভীর মুখে শামুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে, দরজাটা ভেজিয়ে এসো।'

তুই থেকে তুমি এবং গম্ভীর স্বরে দরজা ভেজানোর নির্দেশ শুনেই শামুর মুখের চেহারা বদলিয়ে গেল। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, বাবার দিকে তাকালো। মাধব খাটের মাথার কাছে, টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আঙুল দিয়ে খাট দেখিয়ে বললেন 'এখানে এসে বসো।'

শামুর মুখে উৎকণ্ঠার সঙ্গে এবার একটু ভয় দেখা দিল, দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। ও বাবার দিকে মুখ করে খাটে বসলো। মাধব তাকালেন শামুর চোখের দিকে, শামু তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে আবার তাকালো। মাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্যা কে ?'

প্রশ্নটা এমনই ঝটিতি এবং আকস্মিক, শামু থতিয়ে গিয়ে, নামটাই কেবল উচ্চারণ করলো, 'বন্যা।'

'হ্যাঁ বন্যা।' মাধব গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে সে ?'

শামুর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো, রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে ঘামতে লাগলো। বললো, 'ইয়ে মানে, একটা মেয়ে।'

'সেটা আমি জানি, একটা মেয়ে।' মাধব একটু ধমকের সুরে বললেন, 'সে তোমার কে ?'

'আমার ?' শামুর স্বর একেবারে শুকিয়ে গেল, গলা কাঠ !

মাধব সিগারেটে টান দিয়ে, নিজেই বললেন, 'বোধ হয় তোমার বন্ধু ?'

'মানে—।' শামু ঢোক গিলছে।

মাধব অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'এর আবার মানে, মানে কি আছে ? এ তো সোজা ব্যাপার মেয়েটি তোমার বন্ধু, তুমি আর সে সিনেমায় যাও, রেস্তোরাঁয়, গঙ্গার ধারে, ময়দানে লেকে ঘুরে বেড়াও। তাই তো, না কী ?

শামু মাথা ঝাঁকিয়ে, সম্মতি জানালো, তারপরে বললো, 'হ্যাঁ।'

মাধব কঠিন চোখে শামুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বন্ধু কি ভদ্রলোকের মেয়ে ?'

শামু একটু অবাক হয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

'তুমিও নিশ্চয় ভদ্রলোকের ছেলে ?' জিজ্ঞেস করলেন মাধব।

শামু আর একটু অবাক হয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

মাধব ঠোঁট বাকিয়ে বললেন, 'ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা বন্ধু হলে, তারা যে কেবল রাস্তায় ঘাটে ক্যা ক্যা করে ঘুরে বেড়ায়, তা জানতাম না কেন, বন্ধুকে বাড়িতে ডাকা যায় না ? বাবা মা ভাই বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় না ? ঘরে বসে কথা বলা যায় না ? এটা কী ধরণের বন্ধুত্ব আমি বুঝি না। লজ্জা করে না, একটা ভদ্রলোকের মেয়ে তোমার বন্ধু, আর তুমি তাকে কোনো দিন বাড়িতে আসতে বলো না ?'

শামুর গভীর কোমল চোখ একেবারে গোলাকার হয়ে উঠেছে, চক্ষু তারকা বাবার চোখে নিবদ্ধ। একটা কথাও বলতে পারছে না।

মাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বন্ধুর সঙ্গে কি আমাদের আলাপ হতে নেই ?'

শামু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ—থাকবে তো'।

'থাকবে তো, তা কবো নি কেন ?' মাধব ধমকে উঠলেন, 'যতো বাজে লোকের মুখে সব বাজে কথা শুনতে হয় ? লেখাপড়া শিখে একটা বাঁদব হয়েছিস, না ? জানিস না. না দেখলে জানলে. খালি লোকের মুখে শুনলে মেজাজ খারাপ হয়। তোর মায়েব মেজাজ কি সাধে খারাপ হয়েছে ? তা ছাড়া, আমাদেবও তো ইচ্ছে কবে, আমাদের ছেলে কাদের সঙ্গে মিশছে, তারা কেমন, সেটা জানি। তুই কখনো বন্ধুদের বাড়ি গেছিস ?'

শামু লজ্জা পেয়ে বললো, 'গেছি।'

'তুই একটা আস্ত অসভ্য।' মাধব বলে উঠলেন, 'নিজে গেছিস ওদের বাড়িতে আব নিজেদের বাড়িতে আসতে বলিস নি !'

মাধব উঠে দাঁড়িয়ে আবাব বলেন, 'শুধু শুধু একটা সহজ ব্যাপার-কে জটিল করে তোলা। লোকজনেব কাছে যেন আব কিছু শুনতে না হয়, বলে দিলাম।'

বলে বেরিয়ে গেলেন। বারান্দা দিয়ে, জামাকাপড বদলাবার জন্য নিজের ঘবে গেলেন। গায়ত্রী সেখানে রীতিমতো উৎকণ্ঠিত মুখে বসে ছিলেন। মাধব ঘবে ঢুকতেই তাঁব দিকে তাকিয়ে বললেন. 'কী বললে ? খুব রাগাবাগি কবোনি তো ?'

মাধব বললেন, 'না না, রাগারাগি করবো কেন ? তা বলে বকা ঝকা একটু না করলে হয় ? একটু বকুনিও দিলাম, ব্যাপারটাও বুঝিয়ে দিলাম। এরপর থেকে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গায়ত্রীর মুখের উদ্বেগ কাটলো, তিনি হাসলেন, বললেন, 'এবার

বুঝেছ তো, কেন তোমাকে বলতে বলেছি? হাজার হলেও, ছেলেদের কাছে, মা-ও মেয়েই, বাপের কথা আলাদা। মা বললে যা হয় না, বাবা বললে তা হয়।'

মাধব বললেন, 'চলো তা হলে আজ দুজনে একটু বেরোই।'

গায়ত্রী বললেন, 'চলো। আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।'

বোঝা গেল, গায়ত্রী শামুর ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন। এখন মন বেশ নিরুদ্বেগ, প্রফুল্ল, অতএব স্বামীর সঙ্গে বেরোতেও আপত্তি নেই।

মাধব পরের দিন বিকালে পাঁচটার সময়, অফিসের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এ সময়ে একটা টেলিফোন এলো। রিসিভার তুলে, তিনি কিছু বলবার আগেই, গায়ত্রীর উত্তেজিত গলা শুনতে পেলেন, 'আমি গায়ত্রী বলছি। তুমি শামুকে সেই মেয়েটাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসতে বলেছ?

মাধব কথাটা শুনেই থমকে গেলেন এবং নিজেকে প্রস্তুত করে বললেন, 'কেন, কী হয়েছে?'

গায়ত্রীর উত্তেজিত স্বর প্রায় কান্নারুদ্ধ শোনালো। 'শামু সেই মেয়েটাকে নিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, এতো বড় সাহস! এখন কী না আবার, ঘরে বসে মেয়েটার সঙ্গে গল্প করছে! তুমি বাড়ি এলে, তোমার সঙ্গেও নাকি আলাপ করিয়ে দেবে! কী আস্পর্ধা!'

গায়ত্রীর স্বর কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল। মাধব টেলিফোনে কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলেন। তিনি বুঝতে পারেন নি, ব্যাপারটা এ রকম হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। অথচ তিনি ভালো ভেবেই, শামুকে উপদেশ দিয়েছিলেন। বললেন, 'শোন খুকু—।'

'না, শুনবো না।' গায়ত্রী টেলিফোনে ফুঁসে উঠলেন, 'আমি শামুকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছি, ও বললো, তুমিই নাকি মেয়েটাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসতে বলেছ। সত্যি?'

মাধবের মনে হলো, জিজ্ঞাসাটা উদ্যত খড়্গের মতো তাঁর মাথার ওপরে ঝুলছে। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, 'মানে, আমি—হ্যাঁ—আমি।'

'হ্যাঁ?' গায়ত্রীর প্রায় আর্তনাদ শোনা গেল, 'তুমি তা হলে বলেছ?'

'শোন খুকু—।'

'কিছু শুনবো না। এই তোমার শিক্ষা, ছেলেকে একটা মেয়ের সঙ্গে—।'

'খুকু—'

'চুপ! উহ্ ভগবান, বাবা ছেলেকে এই শিক্ষা দেয়? আমি দাদার বাড়ি যাচ্ছি। এখুনি এই মুহূর্তেই। তোমার সংসারে আমি আর নেই।'

টেলিফোনের লাইন কেটে গেল। মাধব কয়েকবার ডাকলেন, 'খুকু খুকু!' কোনো জবাব না পেয়ে, মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে ভাবতে বসলেন। অফিসের কাজকর্ম মাথায় উঠে গেল, ভাবতে লাগলেন, কোথায় তাঁর ভুল হয়েছে। কোনো ভুলই খুঁজে পাচ্ছেন না। যা বলা উচিত ছিল তাই বলেছেন। মনে মনে তিনি শামুর ওপরে চটে উঠলেন। ভাবলেন, হতভাগাটা গোড়াতেই ভুল করে বসেছে। ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে এখন তাঁকে খেসারত দিতে হচ্ছে। এমন সময়ে তাঁর সহকর্মী অবনী সমাদ্দার দরজা ঠেলে চেম্বারে ঢুকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মাধবদা, আর কতক্ষণ? বাড়ি যাবেন না?'

মাধব বললেন, 'বাড়ি তো যাবো, এদিকে এক কেলেংকারী হয়ে গেছে।'

'কী ব্যাপার?'

'বসো, বলছি।'

অবনী চেয়ারে বসতে, মাধব তাঁকে ঘটনাটা সব বললেন। অবনী সব শুনে, হেসে বললেন, 'দাদা, ছেলের মতো আপনিও গোড়ায় গলদ ক'রে বসে আছেন।'

মাধব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রকম?'

অবনী বললেন, 'আসলে তো ব্যাপারটা বৌদিকে নিয়ে। আপনি ছেলেকে সুনীতি শেখাতে গেলেন, বৌদিকে ঠাণ্ডা করবেন বলেই তো?'

মাধব বললেন, 'হ্যাঁ।'

অবনী বললেন, 'সেইজন্যই আপনার উচিত ছিল, বিষয়টা আগে বৌদিকে বলা, আর তাঁকে কনভিন্স করা। সব মায়েরাই, যে কোনো মেয়ের সম্পর্কে সন্দিহান, এটাও সেই টেনশন, বুঝেছেন তো বিশেষ করে সে যদি আবার ছেলের বৌ বা বান্ধবী হয়, তাঁর সুপ্রিমিটি, তাঁর এগো তিনি কিছুতেই নষ্ট হতে দেবেন না। তাঁর কাছে এসে সবাইকে নত হতে হবে।'

মাধব বললেন, 'সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছিল।'

অবনী বললেন, 'হচ্ছিল, কিন্তু এই গোড়ায় গলদ। বৌদির অনুমতি না নিয়ে, তাঁকে না জানিয়ে, হঠাৎ ছেলের বান্ধবীকে দেখে ক্ষেপে গেছেন, ক্ষেপে তো আগেই ছিলেন।'

মাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে এখন কী করা যায় বলো তো?'

অবনী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভাবতে হবে। যে ভাবেই হোক,

বৌদিকে বোঝাতে হবে, আপনি ভুল করেননি, কিন্তু বৌদিকে আগে না বলাটা খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। এখন এটা খুব কঠিন টাস্ক।'

দুই সহকর্মী গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে, অবনী বললেন, 'আচ্ছা দাদা, বাড়িতে সবাই আপনাকে কী রকম লোক বলে জানে?'

'কী রকম লোক মানে?' মাধব ভ্রূকুটি করলেন।

অবনী বললেন, 'মানে আপনার মেজাজ সম্পর্কে সবাই কী রকম ভাবে। বাড়িতে কি আপনি খুব রগচটা?'

'মোটেই না।'

অবনী বললেন, 'সেটা আমি জানি। আপনি বেশ খোশ্ মেজাজের ঠাণ্ডা মানুষ। কিন্তু রাগ-টাগ করেন না?'

মাধব বললেন, 'করি বৈকি। আমি একবার রাগলে সবাই থরহরি কম্প।'

'বৌদিও?'

'নিশ্চয়, তখন তোমার বৌদিরও কাঁপ ছুটকে যায়।'

অবনী চোখে ঝিলিক দিয়ে বললেন, 'তা হলে দাদা, বৌদির কাঁপ ছুটকেই দিতে হবে। এখন আর নরম হলে চলবে না। গরমে গরম তাল দিতে হবে। মানে আপনাকে একটু অভিনয় করতে হবে। বৌদিকে খালি শুনিয়ে দিতে হবে, আপনি যা বুঝেছেন, তা করেছেন, তিনি কোন সাহসে অবুঝের মতো ব্যবহার করছেন—এই সব। ঠিক মতো বলতে হবে, যাতে বৌদি ফীল করেন, আপনার ওপর দিয়ে তাঁর যাওয়া উচিত হয়নি। তারপরে তো পরে দেহিপদপল্লব মুদারম্ আছেই।'

মাধব একটু ভাবলেন, এবং মনে মনে শক্তি সঞ্চার করার চেষ্টা

করলেন, বললেন, 'ছেলের ম্যাও সামলাতে গিয়ে, বাপের ছ্যাপার্টা একবার ছাখো।'

অবনী বললেন, 'সবই ঠিক ছিল, একটুখানি ভুল হয়ে গেছে।'

মাধব বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথানুযায়ী কাজ করে দেখি। আমার সম্বন্ধী প্রিয়নাথের বাড়িতে গেছেন তোমার বৌদি! সেখানে একটা টেলিফোন করি।'

'কিন্তু দাদা, খুব সামলে।'

মাধব রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। ওদিকে রিঙ্ করার শব্দ হলো, তারপরেই রিসিভার তোলার শব্দ হলো, এবং মহিলা স্বর শোনা গেল, 'হ্যালো।'

মাধব প্রথমেই চড়া সুর ধরলেন. 'কে বলছেন, গায়ত্রীর বৌদি?'

জবাব এলো—'হ্যাঁ, আপনি?'

'আমি মাধব বলছি।' মাধব যেন হুমকে ওঠার মতো বললেন 'ওখানে গায়ত্রী গেছে?'

মহিলার ভীরু উৎকণ্ঠিত স্বর, 'হ্যাঁ।'

'ডেকে দিন এখুনি।'

সঙ্গে সঙ্গে ওপারে 'দিচ্ছি' বলেই চিৎকার শোনা গেল, 'ঠাকুরঝি, শীগ্‌গির এসো। মাধববাবু তোমাকে ডাকছেন।'

কিছুক্ষণ নীরব। মাধব অবনীকে চোখ টিপলেন। ওপার থেকে গায়ত্রীর গম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'হ্যালো।'

মাধব ঝলকে উঠে বললেন, 'কে, গায়ত্রী?'

ইচ্ছা করেই 'খুকু' বললেন না। একটু ত্রস্ত জবাব এলো, 'হ্যাঁ!'

'তুমি কি মনে করো নিজেকে, অ্যাঁ?' মাধব বললেন হুমকানো স্বরে, 'তুমি কি মনে করো, তুমি যা বোঝ, তার উপরে আর কিছু বোঝার

নেই? (গায়ত্রী কিছু বলবার চেষ্টা করলেন) থামো, তোমার কথা আমি পরে শুনবো। তোমার ছেলের জন্য তোমার দুশ্চিন্তা আছে। তেমনি আমার ছেলের জন্য আমারও আছে। বোঝ না কিছুই, আবার রাগ করে বাড়ি ছেড়ে দাদার বাড়ি গিয়ে বসে আছো! (গায়ত্রী আবার কিছু বলবার চেষ্টা করলেন।) চুপ করো, আমাকে বলতে দাও। তুমি আগে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করবে, তারপরে যা খুশি তাই করো গে, আপত্তি নেই। আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি, আর কেন করেছি, তা যদি বুঝতে, তুমিও ছেলের মতো ছেলেমানুষি করে এভাবে বাড়ি থেকে চলে যেতে না। মনে রেখো, আমারও আত্মসম্মান বলে একটা কথা আছে। যাই হোক, আমি অফিস থেকে বেরোচ্ছি। তোমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবো। আমি তোমার দাদার বাড়িতে ঢুকবো না, গাড়ির হর্ণ শুনে চলে আসবে, বুঝেছ?'

গায়ত্রীর স্তিমিত আবার রুদ্ধস্বর শোনা গেল, 'আচ্ছা।'

মাধব রিসিভারটা জোরে শব্দ করে নামিয়ে দিলেন। অবনী ব্যগ্র জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে ছিলেন। মাধব বললেন, 'মনে হয় ঢিলটা ঠিকই লেগেছে।'

অবনী হেসে বললেন, 'এখন পাটকেলটা না ফিরে আসে, সেটা দেখুন। আড়াল থেকে টেলিফোনে এক রকম, সামনাসামনি খুব সাবধান।'

মাধব চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'দেখা যাক, এখন বেরোই।'

মাধব গাড়ি নিয়ে, তাঁর সম্বন্ধী প্রিয়নাথের বাড়ির সামনে গিয়ে জোরে জোরে কয়েকবার হর্ণ বাজালেন। কয়েক সেকেণ্ড পরেই, গায়ত্রী বেরিয়ে এলেন। দরজায় প্রিয়নাথের স্ত্রী, চোখে উৎকণ্ঠার ছায়া।

গায়ত্রীর চোখে উৎকণ্ঠা, অথচ অভিমানের ছায়া। তিনি এসে দরজা খুলে বসলেন। মাধব গাড়ি স্টার্ট করলেন। গম্ভীর মুখ থমথম্ করছে।

গায়ত্রী নিচু বিমর্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদার বাড়ি কী দোষ করেছে, একবার নামলেই হতো।'

মাধব গম্ভীর স্বরে বললেন, 'দাদার বাড়ি কিছু দোষ করেনি কিন্তু মানুষের মনের অবস্থা সব সময় এক রকম থাকে না। তুমি কি বুঝবে। আমার মাথায় এখন কী দুশ্চিন্তা ?'

গায়ত্রী একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, কিসের দুশ্চিন্তা ?'

'কিসের দুশ্চিন্তা!' মাধব প্রায় ধমকে উঠলেন, 'আমি কোথায় ভেবেছি, ছেলে যা করুক, আমাদের চোখের সামনে থাক। আর তুমি কী না, তাদেরই একসঙ্গে বাড়ীতে রেখে চলে এলে ? এর যদি কোনো ব্যাড কনসিকোয়েন্স, হয়, কে দায়ী হবে ?'

গায়ত্রীর মুখ যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল, বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'জানি।' মাধব যেন চাপা গর্জন করলেন, এবং গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলেন।

ওঁরা যখন বাড়ি এসে পৌঁছুলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। বাইরে গাড়ি রেখে বাড়িতে ঢুকে, ভৃত্যের সঙ্গে দেখা হতেই মাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'শামু কোথায় ?'

ভৃত্য বললো, 'ঘরে'।'

'আর কে আছে সেখানে ?'

'এক নতুন দিদিমণি আর রামু ভাই।

রামু শামুর ছোট, বছর দশেক বয়েস। মাধব শামুর ঘরের দরজায়

গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন, শামু ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে বসে, জল রঙ দিয়ে ছবি আঁকছে, বন্যা আর রামু তাই গভীর অভিনিবেশে দেখছে। তাঁর জুতোর শব্দে সবাই ফিরে তাকালো। শামু বলে উঠলো, 'এই বাবা, তুমি এসেছ? এর নাম বন্যা।'

বন্যা নামে মেয়েটাকে এখনো কিশোরী বলা যায়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল স্নিগ্ধ একহারা মেয়েটির চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, মুখখানিও মিষ্টি। ও উঠে এসে মাধবকে প্রণাম করলো। মাধব বললেন, 'থাক থাক, বসো। তুমি কী পড়ো?'

বন্যা বললো, 'ফিজিক্স, অনার্স' ফার্স্ট ইয়ার।

মাধব বললেন, 'বাহ্, সায়ান্স পড়ছো? ভেরি গুড!'

গায়ত্রীও এসে মাধবের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শামু জিজ্ঞেস করলো, 'মা, তুমি হঠাৎ কোথায় গেছলে?'

মাধব জবাব দিলেন, তোর মাকে টেলিফোন করে ডেকেছিলাম। একটু দরকার ছিল। নে, তোরা যা করছিস কর।'

বলে তিনি নিজের ঘরের দিকে গেলেন।

শামু বললো, 'মা, আমাদেব কিছু খেতে দেবে?'

গায়ত্রী বললেন, 'দেব, দিচ্ছি, তোরা বোস।'

গায়ত্রী মাধবেব ঘরে এলেন। মুখ এখনো অন্ধকার, ছলছল চোখে অভিমান। মাধব বললেন, 'এবার বুঝতে পেরেছ, আমি কী চেয়েছি? বাইরে দশ জায়গায় যাবার থেকে আমাদের চোখের সামনে বাড়িতেই থাকুক তাতে ওদেরও মন স্বাভাবিক থাকবে, আমরাও নিশ্চিন্ত। এটাই ভালো না?'

গায়ত্রী রুদ্ধ স্বরে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি কি এইসব জানতাম? তা বলে তুমি আমাকে এরকম করে বকলে?'

মাধব গায়ত্রীকে হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন। গায়ত্রীর চোখ জলে ভরে উঠলো। মাধব বললেন, 'অবিশ্যি তোমাকে আমার আগে বলা উচিত ছিল। কাজকর্মে ছাই কিছু মনে থাকে নাকি?' বলে তিনি গায়ত্রীকে বুকের কাছে নিয়ে, তাঁর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে এলেন। গায়ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, 'বুড়ো বয়েসে আর এ সব ভালো লাগে না, ছাড়ো, আমি ওদের খেতে দেবো।'

বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন। মাধব বললেন, 'বন্যা মেয়েটি তো দেখছি ভালোই।'

গায়ত্রী মাধবের দিকে তাকালেন। মাধব তাড়াতাড়ি বললেন, না না, আমি কিছু ভেবে বলিনি।'

গায়ত্রী বেরিয়ে গেলেন। মাধব মাথায় হাত দিয়ে বসে বললেন, 'বাব্বা! খুব জোর সামলানো গেছে।'

বিচিত্র প্রেম

বিমল কর

দিন চারেক হল অতুল বাড়ি ছাড়া। পাড়া ছেড়েই পালিয়ে এসেছে। যে-রকম কেচ্ছা হয়ে গেল বাড়িতে তারপর কোনো ভদ্রলোকই আর মুখ দেখাতে পারে না। অতুলও মুখ দেখাচ্ছে না। অবশ্য এই মুখ আর দেখার মতনও নেই, চারদিনেই চুপসে গেছে, গালে দাড়ি জমেছে বিস্তর, চোখে হলুদ হলুদ ছোপ ধরেছে, মাথার চুলে জটের গন্ধ। তবু এই মুখই একজনকে অন্তত না দেখলেই নয় বলে অতুল রেল স্টেশনের ডাউন প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে বসে আছে।

এখন এদিকে কোনো গাড়িটাড়ি নেই। কখনো সখনো দু একটা মালগাড়ি যাচ্ছে। যাক। অতুল প্ল্যাটফর্মের কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় গোল করে বাঁধানো সিমেন্টের বেদীতে বসে। বসে বসে বিকেলের আকাশ দেখছে উদাস চোখে, মাঠঘাট নজর করছে বিষণ্ণ ভাবে, লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলছে, সিগারেট টানছে ঘন ঘন। আর থেকে থেকে দূরে ওভারব্রিজের দিকটা লক্ষ্য করছে।

অতুলের অপেক্ষার অবসান হল আরও খানকটা পরে, বিকেলের আলো যখন মাঠঘাট ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়েছে এবং ক্রমশই ফিকে হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে—তখন।

প্রীতি কাছাকাছি আসতেই অতুল আবার বড় করে নিশ্বাস ফেলল। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল প্রীতিকে। অতুলের মতন লণ্ডভণ্ড চেহারা নয়, মোটামুটি ফিটফাট। ছাপা শাড়ি, কলাপাতা রঙের ব্লাউজ, চোখমুখ পরিষ্কার। বাঃ, বেশ! তোফা আরামে আছ মাইরি! সত্যি, মেয়েরা একটা জিনিস। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, তারপরও যেমনকে তেমন, মুখে পাউডার মাখতেও ভোলে নি। অতুলের রীতিমত অভিমান হল, কিংবা হয়তো ক্ষুব্ধই হল সে।

প্রীতি এসে সামনে দাঁড়াল। নজর করে দেখতে লাগল অতুলকে। তারপর একটা 'ইস্' শব্দ করল, দুঃখে না বিরক্তিতে বোঝা মুশকিল।

অতুল বলল, 'যাক্, তা হলে এসেছ? আমি ভাবছিলাম, আসবে না।' ক্ষোভের গলাতেই বলল অতুল।

প্রীতি বলল, 'বাঃ, কাজকর্ম সেরে আসব না। তা ছাড়া আমি খবরই পেলাম দুপুরে। যোগেন গিয়ে বলল, তুমি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা করতে বলেছ! এত জায়গা থাকতে এই প্ল্যাটফর্ম তোমার মাথায় এল কেন জানি না, বাবা! বাড়ি থেকে কম দূর?'

অতুল গম্ভীর মুখে বলল, 'প্ল্যাটফর্মই ভাল। অনেক মালগাড়ি যাচ্ছে। দু পা এগিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলেই চলবে।'

প্রীতি টেরা চোখ করে কটাক্ষ হানল। বলল, 'আহা—কী কথা রে!'

অতুল একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। প্রীতি ততক্ষণে পাশে বসেছে।

'তোমার মার খবর কী?' অতুল জিজ্ঞেস করল।

'মা ভাল হয়ে গেছে।...তবে বেশ গম্ভীর। কথাবার্তা বেশী বলে না।

অতুল একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কেরাসিন তেলের এফেক্ট বোধ হয় এখনও স্টমাক থেকে তেলের গন্ধ উঠছে।'

প্রীতি আড় চোখে দেখল অতুলকে। বলল, 'তোমার বাবার খবর রাখ?'

'শুনেছি ভাল আছে।'

'শুধু ভাল কেন, সেই বুড়ো তো লাফ মেরে মেরে নাচছে • বগল বাজাচ্ছে।'

অতুল ঘাড় ফিরিয়ে প্রীতির দিকে তাকাল। শ্লেষের গলায় বলল, 'কথাগুলো কে শিখিয়ে দিয়েছে? তোমার মা?'

প্রীতির মাথা গরম হয়ে উঠল। 'আমার মা যা শিখিয়েছে তোমার বাবা তোমাকে তার চেয়েও বেশী শিখিয়েছে।'

অতুল সিগারেটের টুকরোটা রাগের মাথায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'আমার বাবা সম্পর্কে একটা রেসপেক্ট আমি তোমার কাছে আশা করি। নিজের শ্বশুর সম্পর্কে তোমার যে সব কথাবার্তা, বুড়ো লাফ মেরে মেরে নাচছে, বগল বাজাচ্ছে...ছি ছি...এসব কথা কানেও শোনা যায় না।'

প্রীতি বাঁ হাতটা মুঠো করে বুড়ো আঙুল দেখাল। তোমার বাবা আমার শ্বশুর? বয়ে গেছে আমার। তোমার বাবা আমার ইয়ে—' বলে বুড়ো আঙুল নাড়াতে লাগল।

অতুল একেবারে থ'। কান কপাল গরম হয়ে উঠতে লাগল। সামান্য তোতলানো জিভে অতুল বলল, 'আমার বাবা তোমার শ্বশুর নয়?'

'না।'

'অফিসিয়ালি নয়, কিন্তু আন্‌-অফিসিয়ালি তো বটে।'

'মোটেই নয়। অমন লোককে আমি শ্বশুর করব না। একটা সত্তর বছরের বুড়ো—ছুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে ন্যাকামি করে বাড়ি মাথায় করল—ওই লোককে আমি শ্বশুর করব! কখনো নয়।'

অতুল বেশ চটে গিয়েছিল, কিন্তু অবস্থাটা যা তাতে পুরোপুরি ঝগড়া করাও যায় না। সে তো মেয়ে নয়, পুরুষ। তার খানিকটা সংযম ও কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার। অতুল বলল, আমার বাবা সম্পর্কে তুমি যা-তা বলছ! সত্তর বছরের বুড়ো আমার বাবা নয়। সিক্সটি ফাইভ সিক্স হবে। ন্যাকামি করাব জন্যে কেউ স্লিপিং ট্যাবলেট খায় না…'

'ভীমরতি হলে খায়।' প্রীতি বেকা গলায় বলল।

'তোমার মা-ও কেরাসিন তেল খেয়েছিল' পালটা ঠোকর দিল অতুল, 'তোমার মা কচি খুকি নয়। বয়সটাও ষাটের কাছাকাছি। আমিও তো বলতে পারি তোমার মা ন্যাকামি করে কেরাসিন তেল খেয়েছিল।'

প্রীতি রুক্ষ গলায় বলল, 'আমার মাকে তুমি ছেড়ে কথা বলছ নাকি? প্রথম থেকেই তো যা তা বলছ!…তুমি বলো নি, মার স্টম্যাক থেকে এখনও কেরাসিন তেলের গন্ধ উঠছে?'

অতুল আর এগুলো না; হল্ট মেরে গেল। চেঁচামেচি ঝগড়া বচসা করে লাভ হবে না। অতুল বলল, 'সরি! আমার অন্যায় হয়েছে! আসলে আমার মাথার ঠিক নেই। কটা দিন যা যাচ্ছে! কিন্তু তুমি এটা বুঝে দেখো, তোমার মা যদি আগে কেরাসিন তেল না খেত—আমাব বাবা স্লিপিং ট্যাবলেট খেত না। এই কেলেঙ্কারীর শুরু তোমার মা করেছে, আমার বাবা নয়।'

প্রীতি পিছিয়ে যাবার পাত্রী নয়। বলল, 'আমার মা কেরাসিন খেয়েছিল তোমার বাবার জন্যে। তোমার বাবা দোতলায় খোলা বারান্দায় এসে আমার মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গালাগাল দিত। বলত, ছেলেচোর ডাইনী, সর্বনাশিনী, আমার মার জিভ নাকি মা কালীর মতন লকলক করছে। এ-সব কথা শুনলে কার মাথার ঠিক থাকে। আমার মা ছেলেচোর? তুমি কোন্ রাজপুত্তুর যে তোমাদের ওই ধ্যাড়-ধেড়ে দেড়খানা বাড়ির লোভে তোমায় চুরি করবে! নিজেকে তুমি রাজপুত্তুর ভাবো নাকি? বেঁটে বাঁটকুল চেহারা, বিদ্যে তো বি. কম. চাকরি করো ব্যাঙ্কে—কেরানীর। তোমার মতন রাজপুত্তুর এ-শহরে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বেশী কথা বলো না।'

অতুল একেবারে স্তম্ভিত হয়ে প্রীতির দিকে তাকিয়ে থাকল। এ মেয়ে না রক্ষেকালী? জিভটা শান দিয়ে এসেছে নাকি প্রীতি? এতটা দেমাকই বা কিসের? তুমি কোথাকার রাজকুমারী গো? হাইট্ তো পাঁচ এক, মোটা হিলের জুতো পরলে ইঞ্চিখানেক বাড়ে। গায়ের রঙটা একরকম ফরসা তা বলে তুমি সোনার বরণ নও। চাপ্টা-থ্যাবড়া চেহারা, ভোঁতা নাক, ছোট কপাল, খরখরে চোখ। নিজের চেহারাটা আয়নায় গিয়ে দেখো না সখি, দেমাক ভেঙে যাবে। লেখাপড়াতেই বা কী? কোনো রকম টুকে-টাকে বি. এ-টা পাস করেছ।

অতুল মুখ ফিরিয়ে রেল লাইনের দিকে তাকাল। যেন এখন একটা মালগাড়ি থাকলে সে বোধহয় ঝাঁপ মেরে বসত।

একটু চুপচাপ। শেষ আলোটুকুও কখন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। মাসটা ভাদ্র। হয়ত শেষাশেষি। গাছপালা মাটির ভেজা-ভেজা গন্ধের সঙ্গে শরতের হাওয়া মিশে রয়েছে। আর সামান্য পরেই ঝাপসা অন্ধকার নামবে।

অতুলের বুকের মধ্যে মোচড় মারতে লাগল। একেই বলে জগৎ! সেই কবে—টুনি—যার কিনা পোশাকী নাম প্রীতি—সেই টুনির সঙ্গে তার সম্পর্ক। টুনি যখন ইজের পরত আর হরদম ইজেরের দড়িতে গিঁট লাগাত, গায়ে থাকত পেনি ফ্রক, মাথায় বব চুল- তখন থেকে টুনির সঙ্গে অতুলের গলাগলি সম্পর্ক। কতদিন টুনি অতুলকে দিয়ে ইজেরের দড়ির গিঁট খুলিয়ে নিয়েছে। সে সব দিনে টুনি যত ছেলেমানুষ ছিল অতুল অতটা ছিল না—টুনি পাঁচ, অতুল দশ—বছর পাঁচেকের ছোট বড়। সেই টুনি এখন একুশ, অতুল ছাব্বিশ। এত বছরের ভাব ভালবাসার পর টুনি আজ বলল, তুমি কোথাকার রাজপুত্তুর গো, ওই তো বেঁটে বাঁটকুল চেহারা, বিদ্যেতে বি. কম, ব্যাঙ্কের কেরানী…!

অতুল ডান হাতটা মাথার চুলে চিরুনির মতন করে চালিয়ে দিল। বুক হুহু করছে, এবং মনে হচ্ছে অসাড় বেল লাইনের মতন তার হৃদয়-ট্রিদয়ও কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। গলার কাছটায় ফুলে উঠল অতুলের। কিন্তু এই রকমই হয়, এই তো জগৎ সংসার, প্রেম, ভালবাসা।

অতুল বেশ শব্দ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'তা হলে আর কী! আমি যখন রাজপুত্তুর নই তখন এইখানে একটা শেষ-টেষ হয়ে যাক।'

প্রীতি এই সন্ধের মুখে কয়েকটা বককে সোঁ-সোঁ করে উড়ে যেতে দেখছিল। এবং টেরা চোখে অতুলকেও। বলল, 'করো না শেষ টেষ, আমার কী!'

অতুল মুখ উঁচু করে ওপারের প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল। বলল, 'একুশটা বছর আমার নষ্ট হল। ওয়েস্ট….'

'একুশ কেন?'

'তোমার পাঁচ-ছ বছর থেকে ধরছি। আজ আমার ছাব্বিশ।'

'তুমি তোমার খুশি মতন ধরবে? আমার যখন পাঁচ-টাঁচ তখন আমি এখানে থাকতাম নাকি? মার সঙ্গে মামার বাড়িতে আসতাম-টাসতাম। আমি এখানে রয়েছি পাকাপাকি ভাবে চোদ্দ পনেরো থেকে।' বলে প্রীতি পিঠের বিনুনি বুকের ওপর টেনে নিল। বিনুনি নিয়ে কারুকর্ম করতে করতে বলল, 'একুশ থেকে দশ বাদ দাও। তা হলে থাকছে এগারো। এগারো বছরের সম্পর্ক বলতে পারো ··।'

অতুল যদি পুরুষমানুষ না হত হয়ত কেঁদে ফেলত। মেয়েরা কি এই রকম নিষ্ঠুর হয়? ফ্রেইলিটি না ক্রুয়েলিটি কোন্‌টা মেয়েদের ঠিক ঠিক ভূষণ! কথার জবাব দিল না অতুল। আবার একটা সিগারেট ধরাল। টনি যা বলেছে সেটা কোনো হিসেবই নয়। টুনি তো জন্মেছেই এখানে। তবু অতুল জন্মকাল থেকে ধরছে না। টুনির বাবা কাতরাসগড়ের লোক। সেখানেই থাকত টুনিরা। এখানে টুনির মামার বাড়ি। অতুলদের বাড়ির পাশেরটাই টুনির মামাবাড়ি ছিল। টুনির মাকে বরাবর পিসীমা বলে এসেছে অতুলরা। সেই পিসীমার বিয়েও দেখেছে অতুল—কিন্তু মনে নেই। টুনির জন্মও মনে পড়ে না; কেননা অতুল তখন খুবই বাচ্চা ছিল। কিন্তু যখন থেকে মনে আছে তখন থেকে বাদ দেবে কেন? অতুল কি বলছে, টুনিরা এখানে বরাবর থাকত? না, অতুল সে-কথা বলছে না। অতুল বলছে, ওই পাঁচ-টাঁচ থেকে—টুনির যখন পাঁচ অতুলের বছর দশ বয়েস—তখন থেকে সব তার মনে আছে। টুনি পিসীমার সঙ্গে মামার বাড়িতে আসত যেত, মাঝে মাঝেই আসত, ছুটি-ছাটায় থাকত, আবার ফিরে যেত। একেবারে পাকাপাকি ভাবে অবশ্য এল টুনির

বাবা মারা যাবার পর। এখানে বাড়িতে ছিল টুনির দিদিমা। তিনি আগেই গিয়েছিলেন, টুনির মামা তখন বেঁচে, মামী মারা গেছেন, ছেলেপুলেও নেই, কাজেই পিসীমা আর টুনির বরাবরের জায়গা হয়ে গেল এ-বাড়িতে। সেই মামা—তিনিও বছর দুই হল মারা গেছেন। এখন টুনিরাই ও-বাড়ির মালিক। বাড়িতে লোকজনও কম। নিচে এক ঘর ভাড়াটে আছে, ওপরতলায় থাকে টুনিরা।

সিগারেটে পর পর কয়েকটা টান মেরে অতুল বিমর্ষ গলায় বলল, 'হিসেবটাকে তুমি আরও ছোট করতে পারো, আমি পারি না। মেয়েরা বরাবর কৃপণ। আমি তোমার মতন কিপ্টে হতে পারব না।'

প্রীতি ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'ছেলেরা হিসেব বাড়াতে পারে, তিলকে তাল করে—আমি তোমার মতন হিসেব বাড়াতে পারব না।'

'পেরো না।'

'পারব না। এগারো বছর ধরতে পারি।'

'ও কে। সেই এগারো বছরের রিলেসান আজ শেষ হোক।'

'হোক। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'জানি জানি। আমি তো রাজপুত্তুর নই। বেঁটে বাঁটকুল চেহারা, ব্যাঙ্কের কেরানী, বি কম। তুমি তো রাজকন্যে। হাঁটলে পায়ের নোখ থেকে ইয়ে ঝরে পড়ে।'

প্রীতি কনুই দিয়ে খোঁচা মারল অতুলকে। অতুল কাতরে উঠল।

প্রীতি বলল, 'চ্যাটাং চ্যাটাং কথা যদি বলবে, চিপটিনি কাটবে—তোমায় আমি শেষ করে দেব।'

'আমি কিছু অন্যায় বলি না।'

'ন্যায় বলেছ?'

'হ্যাঁ।'

প্রীতি দু' মুহূর্ত তাকিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। 'তা হলে চলি!'

অতুল থতমত খেয়ে গেল। প্রীতি এইভাবে উঠে দাঁড়াবে সে ভাবতে পারে নি। বলল, 'আমি তোমায় যেতে বলি নি।'

'তা হলে ন্যাকামি করছ কেন?'

অতুল আর কথা বাড়াতে ভরসা পাচ্ছিল না। বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা ছিল।'

'বলো।'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় নাকি! বসো।'

'চাঅলা ডাকো।'

'এখানে চাঅলা কই?'

'ওদিকের প্ল্যাটফর্মে আছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকো।'

অগত্যা অতুলকে উঠতে হল, ওভারব্রিজের দিকে হেঁটে গেল খানিকটা। হাঁক পাড়ল বারকয়েক। টি স্টলের কেউ এদিকে আসবে মনে হল না। অতুলকেই লাফ মেরে রেল লাইনে নামতে হল, তারপর ওদিককার প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়ল।

চা এনে প্রীতির হাতে দিচ্ছে যখন অতুল—তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

প্রীতি বসল না। পায়চারি করতে লাগল প্ল্যাটফর্মে। পাশে পাশে অতুলও। অতি মনোরম হাওয়া দিয়েছে তখন। তারা ফুটতে শুরু করেছে। প্রীতি হাওয়ায় আঁচল উড়িয়ে পায়চারি করতে করতে গুনগুন করছিল।

অতুল বলল, 'তুমি এত ফুর্তি পাচ্ছ কেমন করে আমি বুঝতে পারছি না।'

'একটা সিগারেট দাও না?'

'সিগারেট !'

'আরও ফুর্তি দেখাব।'

অতুল অবাক। এক আধবার সে নিজেই টুনির মুখে নিজের সিগারেট ঠেকিয়ে দিয়ে টানতে বলেছে, কেননা টুনি সিগারেটটা ঠোঁট টিপে রাখতে পারে না, জিভ লাগিয়ে ভিজিয়ে দেয়। অতুল যখন সেই সিগারেটটা আবার টেনে নিয়ে নিজের মুখে ঠোঁটে চেপে ধরে— অন্যরকম একটা স্বাদ লাগে তার, বেশ চনমন করে মনটা। কিন্তু আজ হল কি টুনির? সিগারেট ফুঁকতে চাইছে।

'তোমার যতই ফুর্তি হোক, আমার হচ্ছে না', অতুল বলল, 'আমি মরে আছি।'

'কেন ?'

'কেন ? তোমার মা—মানে পিসীমা খেল কেরাসিন তেল, আমার বাবা স্লিপিং ট্যাবলেট। পাড়ায় একটা কেচ্ছা হয়ে গেল। এরকম কেলেঙ্কারী আর কখনও হয় নি। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। পাড়ায় গিয়ে মুখ দেখাব কেমন করে ?'

'আমি তো দেখাচ্ছি।'

'তোমার · ' অতুল কোনো রকমে সামলে নিল। বলতে যাচ্ছিল—তোমার দু কান কাটা। সামলে নিয়ে বলল, 'তোমার প্রচণ্ড সাহস। তা ছাড়া তুমি মেয়ে- যাবেই বা কোথায় ! আমার মতন তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বন্ধুদের মেসে গিয়ে থাকতে পারবে না।'

'তুমি থাকছ কেন ? কে বলেছে থাকতে ?'

'বলাবলির দরকার করে না ! যা কেচ্ছা হয়ে গেল—এরপর কোন্ ভদ্দরলোক বাড়িতে থাকতে পারে বলো—? আমার দাদাটি তো গিলে খাচ্ছে আমায়, বউদি মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বসে

আছে।' অতুল সখেদে বলল। টান মারল সিগারেটে, তারপর আবার বলল, 'সমস্ত কেলেঙ্কারীটা আমাদের নিয়ে। শালা বিয়ে করব আমরা, প্রেম করব আমরা। এটা আমাদের বিজনেস। তোমাদের কী? তোমার মা—মানে পিসীমার রাগ করে কেরাসিন তেল খাওয়াই বা কেন, আর আমার বাবার স্লিপিং ট্যাবলেট গিলে মরতে যাওয়াই বা কেন? লোকে বলে না, বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়, আমার বাবার তাই হয়েছে। এমনিতেই তো গলাবাজি করে সংসার কাঁপিয়ে রেখেছে তারপর ওই জেদ, জবরদস্তি। মরে যেতে ইচ্ছে করে, ভাই।'

প্রীতি হেসে ফেলল।

অতুল বলল, 'হেসো না, হাসার ব্যাপার এটা নয়। আমার বাবা একটি ওয়াণ্ডার। ছেলেকে জব্দ করতে কোনো বাপ ঘুমের ওষুধ খায়, শুনেছ?'

প্রীতি আরও জোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে নুয়ে গেল।

'হাসছ?' অতুল বলল।

'তোমায় জব্দ করতে না আমার মাকে জব্দ করতে?'

'পিসীমাকে জব্দ করতেও হতে পারে—তবে ওটা সেকেণ্ডারী। আমারটাই প্রাইমারী।'

প্রীতি অতুলের গায়ে ঠেলা মারল কাঁধ দিয়ে। বলল, 'তুমি ঘোড়ার ডিম বুঝেছ! তোমার কোনো ব্যাপারই নেই।'

'নেই?'

'না মশাই, তোমার কেসই এটা নয়। মাকে নিয়েই সব ঝঞ্ঝাট। মা রোজ রোজ তোমার বাবার—মানে মামার—এখনও মামাই বলি—মামার হম্বিতম্বি, গালি-গালাজ, তড়পানি শুনতে শুনতে মনের দুঃখে

কেরাসিন খেয়েছিল। পুরো বোতল খায় নি। আধ বোতল কি সিকি বোতল হতে পারে। আজকালকার কেরাসিনে যা জল, কতটুকু আর কেরাসিন পেটে গেছে—' বলতে বলতে প্রীতি ফট করে অতুলের মুখ থেকে সিগারেটটা টেনে নিল। নিয়ে নিজেই বার দুই টানল। টেনে থু থু করে ছুঁড়ে ফেলে দিল প্ল্যাটফর্মে।

অতুল ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল; কেউ যদি দেখে ফেলে। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা।

অতুল বলল, 'পিসীমা কেরাসিন তেল খেয়েছে শুনেই বাবার ঘুমের বড়ি খাবার জেদ চেপে উঠল বলছ?'

'তা আর বলতে।...তুমি কেরাসিন তেল খেয়ে আমায় জব্দ করবে ভাবছ, দাঁড়াও, আমি ঘুমের ওষুধ খাব···এই আর কি!' প্রীতি হাসছিল।

অতুল মাথা চুলকে বলল, 'আমার একটা ডাউট আছে। বাবা মাত্র দুটো বড়ি খেয়ে ইয়ে হবে কেমন করে ভাবল? ঘুমের ওষুধ পেলই বা কোথায়?'

প্রীতি বলল, 'ঘুমের ওষুধ না কচু, সোডার ট্যাবলেট খেয়েছে—কে আর দেখতে গেছে?'

অতুল জোর করে অস্বীকার করতে পারল না।

'প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে পৌঁছে এবার ওরা ফিরতে লাগল।'

অতুল বলল, 'বাবার এই ছেলেমানুষীর কোনো মানে হয় না। সমস্ত বাড়িতে একটা রই-রই পড়িয়ে দিল। পাড়াময় রটে গেল, জনার্দনবাবু ঘুমের ওষুধ খেয়ে মরতে গিয়েছিল। স্ক্যাণ্ডেল্!'

'আমার মা-টিও ওই রকম; তবে তোমার বাবার মতন অতটা নয়!'

অতুল চুপ করে কয়েক পা হেঁটে এল। তারপর বলল, 'দুজনের

এই জেদাজিদি কেন আমি বুঝতে পারি না। কে কাকে জব্দ কর
তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে নাকি?'

প্রীতি কিছুক্ষণ কথা বলল না, না বলে অতুলের বাঁ হাত নিজে
ডান হাতে ধরে দোলাতে লাগল। যখন বেশ জোরে জোরে ওদের হা
দুলছিল—তখন আচমকা হেসে ফেলে প্রীতি বলল, 'তুমি একেবা
কাঁচকলা। কিচ্ছু বোঝ না!'

'বুঝব কী! এর কিছু বোঝা যায় না।'

'যায় মশাই, যায়।'

'কী যায়?'

'বলব?'

'বলো!'

'তোমার বাবা লোকটি আমার মার সঙ্গে যৌবন বয়সে খু
প্রেম করত।'

অতুল প্রীতির হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লাফ মেরে উঠল
বলল, 'প্রেম—মানে বাবার ভাষায় প্রণয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রণয়। পাশাপাশি বাড়ির ছেলেমেয়ে—ইয়ে
বয়েস থেকেই প্রণয়!'

'যাঃ যাঃ!' অতুল হাঁচির শব্দর মতন যাঃ যাঃ করল।

প্রীতি বলল, 'মোটেই যাঃ যাঃ নয়। তোমার বাবা একটা ই
—কোনো সাহস নেই, ভীতু, ডরপোকা। মার বিয়ে হয়ে গেল
তোমার বাবার আর তো কোন ক্ষমতা হল না—মার ওপর রা
নিয়ে বসে থাকল। সেই জের এখনও চলছে...'

অতুল সন্দেহের গলায় বলল, 'আমার বাবা তোমার মার সঙ্গে
প্রেম করত কে বলেছে?'

'দেখেছি,' প্রীতি সটান গলায় বলল।

'তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ মশাই দেখেছি! তোমার বাবার দেওয়া একটা বই মা এখনও কী যত্ন করে রেখে দিয়েছে। তাতে কি লেখা আছে জানো? লেখা আছে—আমার আদরের ধন লক্ষ্মীমণিকে।'

অতুল এবার সত্যি সত্যি লাফ মেরে উঠল। 'যাঃ শালা! এই কেস! কী বই, মাইরি?'

'চন্দ্রশেখর।'

'এই বইয়ের কথা তুমি আগে বলো নি তো?'

'আগে ছাই আমি দেখেছি নাকি। মা কোথায় লুকিয়ে রাখত কে জানে! বইটা তো সেদিন দেখলাম; মার কেরাসিন তেল আর তোমার বাবার ঘুমের ওষুধ খাবার পর। মা এখন মাথার কাছে বইটা রেখে শুয়ে থাকে।'

অতুল বারকয়েক মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে নিল। ফস্ করে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, 'আমার বাবাটা চরিত্রহীন নাকি?'

'চরিত্রহীন?'

'না তেমন চরিত্রহীন নয়। ক্যারেকটার নেই আর কি। প্রেম করতিস তো করতিস—সো হোয়াট? বিয়ে করলেই লেঠা চুকে যেত।'

প্রীতি জোরে চিমটি কাটল অতুলকে। তারপর জিভ দেখাল। 'ঘোড়ার মতন বুদ্ধি তোমার। তোমার বাবা আর আমার মা বিয়ে করলে—আমাদের কী হত মশাই? তোমায় যে দাদা বলতে হত!'

অতুলের খেয়াল হল যেন ব্যাপারটা। জিভ কেটে ফেলল। বলল, 'রিয়্যালি, আমার কোনো সেন্স নেই। খাজা মাথা। তুমি

ঠিক বলেছ! আমাদের ব্যাপারটার জন্যে ওদের স্যাক্রিফাইস করা উচিত ছিল। যাক্ গে, ওই বইটা আমাকে দিয়ো।'

'কী করবে বই নিয়ে?'

অতুল রহস্যময় মুখ করে হাসল, ততোধিক রহস্যময় গলায় বলল, 'ব্ল্যাকমেইল করব। প্রেসার দেব। তোমার আমার ব্যাপারে বাবা এবার যদি ঝামেলা করে—বইটা আমি আমার মার হাতে তুলে দেব। মা একটিবার শুধু দেখুক আমার ফাদারমশাই কাকে আদরের ধন 'লক্ষ্মীমণি' বলতেন। ব্যস, ওতেই হয়ে যাবে। কিস্সু আর করতে হবে না আমাদের।'

প্রীতি একটুর জন্যে থমকে দাঁড়াল। তারপর দমকা হেসে উঠল হাসি আর থামতেই চায় না। হাসতে হাসতেই বলল, 'ভীষণ বুদ্ধি তো তোমার! এতো বুদ্ধি ওই মাথায় ধরে রেখেছিলে! দেখি—দেখি—' বলে প্রীতি হাত বাড়িয়ে অতুলের চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা নিজের মুখের কাছে নামিয়ে নিল। তারপর চকিতে একবার চারপাশ দেখে নিল প্ল্যাটফর্মের। কেউ নেই।

অতুল মুখ তুলে ভেজা গালের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'বড্ড দাড়ি হয়ে গিয়েছে। স্কিনে টাচ করল না।'

দুজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে। হাসতে হাসতে ওভার ব্রিজের দিকে এগিয়ে চলল।

———

ক্রিকেট

রূপদর্শী
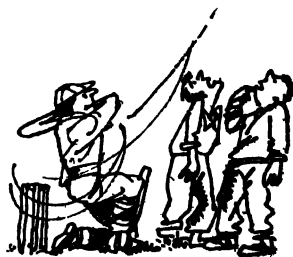
সুনীত ঘোষ মবীয়া হয়ে বললে, তাহলে কি কোন উপায়ই নেই বলতে চান ?

সুনীল বোস বললে, উপায় থাকবে না কেন ? পাড়ার মস্তানদের দলে ভীড়ে হয় গেট ভেঙ্গে স্টেডিয়ামে ঢুকুন, আর নয় সুবোধ বালকটি হয়ে বিড়ির দোকানে রেডিওর কমেণ্টারি শুনুন। টিকিট কেনবার বাসনা যদি মনের কোণে পুষে রেখে থাকেন তো সেটাকে গঙ্গাসাগরে, ভাসিয়ে দিন। আর-জন্মে যদি ক্রিকেট কর্ত্তাদের রিলেটিভ রূপে কলকাতায় জন্মাতে পারেন, তাহলে হয়ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

সুনীত ঘোষ ব্যাজার হয়ে বললে, খেলা দেখার মনোবাঞ্ছাটা যদি আমার হত, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি ? কান দিয়েই খেলা দেখার সুখ মেটাতাম। ইচ্ছেটা জজ সাহেবের কিনা।

সুনীল বললে, জজ সাহেবের। জজের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ?

• সুনীত থতমত খেয়ে বললে, আমার সঙ্গে তাঁর ডিরেক্ট সম্পর্ক কিছু নেই। তবে উকীলদের সঙ্গে তো সম্পর্ক আছে। তাই আমার উকীলবাবু বললে—

যত্নদা টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন আর কান পেতে সুনীতের কথা শুনছিলেন।

ফস্ করে বলে বসলেন, সে কি মশাই, সে মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয় নি!

বলেই জিভ কেটে টেলিফোনে বললেন, ওঃ ভেরি সরি, না আপনাকে নয়, কথাটা বললাম আমার এক ফ্রেণ্ডকে। সামনেই বসে আছেন। হ্যাঁ, মেয়াদী মামলা। আবার কি, সেই বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়ার চিরকেলে ডোমেস্টিক ঝগড়া। কি বললেন, ক'দিনের মামলা? এই মশাই—

যত্নদা সুনীত ঘোষকে জিজ্ঞেস করলেন, ক'দিনের মামলা?

সুনীত বললে, এই তিন বছরে পড়ল।

যত্নদা টেলিফোনধারীকে বললেন, এই থার্ড ইয়ারে পড়ল।

হাঃ হাঃ হাঃ! যা বলেছেন। আচ্ছা, ঐ কথাই রইল।

রিসিভারটি ঠক করে রেখে যত্নদা মন্তব্য করলেন বাড়ি ভাড়ার বখেড়া মেটাতে আদালতের তিন বছর পার হয়ে যায়! যা হচ্ছে না আজকাল! কি আর বলব।

সুনীত ঘোষ বললে, সেই জন্যই তো আমার উকীল টেস্ট খেলার একখানা টিকিট যোগাড় করতে বললে।

সুনীল বোসের মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল।

যার বাব্বা, তা আপনার মামলার সঙ্গে টেস্ট খেলার রিলেশন কি?

সুনীত ঘোষ এবার চটে গেল।

একখানা টিকিট দেবার মুরোদ নেই। তখন থেকে খালি টিক টিক বছেন। রিলেসান কি, সম্পর্ক কি? যত সব ফালতু কোশ্চেন। রিলেসান কি একটা যে, এক কথায় বলব!

সুনীত ঘোষ মাটির মানুষ। সাত চড়ে রা কাড়ে না। তাকে হুম রে খেপে উঠতে দেখে সুনীল বোস ঘাবড়ে গেল। টাকে বার য়েক হাত ঘষে নিল।

তারপর আমতা আমতা করে বললে, তা চটছেন কেন?

সুনীত ঘোষ লজ্জায় স্বর খাদে নামিয়ে ফেলল।

বললে, মাথার ঠিক নেই মশাই, মাপ করবেন। শিরে সংক্রান্তি কনা। মামলায় হেরে গেলে যে কেয়ার অফ্ ফুটপাত হয়ে যাব। টেস্টের টিকিট ছিল লাস্ট চান্স। কিন্তু সে চান্সও তো দেখছি াংকচারড় হয় হয়।

ব্যাপারটা তাহলে বলি। যে জজের এজলাসে আমার মামলা, াব একটিই মাত্র মেয়ে। আর সে মেয়ে আবার ক্রিকেট ফ্যান। াব্বাস আলি বেগের গলায় মালা দেবার চান্স পেল না বলে অন্নজল াাগ করেছিল। মাদ্রাজে কুন্দরামের খেলার রেজাল্ট দেখে আশায় ক বেঁধে বসে আছে। নিজে হাতে রেশমের মালা গেঁথে রেখেছে শাই। যদি কুন্দরাম কলকাতার টেস্টে কোয়ার্টার সেঞ্চুরীও করতে ারে তাহলে আর কথা নেই। আলুথালু হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে যাবে, ন্দরামের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়েই তার গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দে চ্ছা যাবে। প্ল্যান সব ঠিক করে রেখেছে। এমন সময় বিস্মিল্লায়

গলদ, সিজিন টিকিট গায়েব হয়ে গেল। বাপকে বললে, টিকিট একটা যোগাড় করে দেবে তো দাও, নইলে এই হাঙ্গার-স্ট্রাইক করলুম আদুরে মেয়ে তো! যে কথা সেই কাজ। আজ সাতদিন ধরে সেরেফ অনশন। শুধু সেদ্ধ ডিম আর কফি খাচ্ছে। জজ-গিন্নি দুবেলা কপাল চাপড়াচ্ছেন আর 'কি লোকের হাতে বাপ আমাকে তুলে দিয়েছেন গো' বলে নন্ স্টপ্ বিলাপ শুরু করছেন। এ অবস্থায় কেউ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারে, বলুন। রোজ জজ সাহেব যে মেজাজ নিয়ে এজলাসে আসছেন, তাতে কি করতে যে কি করে বসবেন সেই ভাবনায় আমার উকীল অস্থির। না হলে যে উকীল তিন বছর ধরে আমাকে 'নির্ঘাৎ জিতে যাবেন' বলে ভরসা দিয়ে এসেছেন, তিনি এখন বললেন কিনা, 'কিছু বলা যায় না মশাই, হাওয়া বড় খারাপ বাঁচতে চান তো শিগ্গির একখানা টিকিট যোগাড় করুন।'

একটু থেমে সুনীত বললে, এখন বুঝলেন রিলেসনটা। কি করি বলুন তো?

বললুম, এতই যখন দরকার তখন ব্ল্যাক মার্কেটের দ্বারস্থ হন।

সুনীত বললে, সে চেষ্টাও করেছি মশাই। দুদিন আগে আমাদের পাড়ার হেবোদার হাতে উনিশখানা পঁচিশ টাকার টিকিট দেখলাম আমায় বললে, নিবি। আমার কস্ট প্রাইস্ পড়েছে চাল্লিশ। কাল পর্যন্ত ষাট টাকায় ঝেড়েছি। আজ সেভেনটি ফাইভে তোকে একখানা দিতে পারি। আসছে কাল সেঞ্চুরি করব মাইরি। নিবি তো এই বেলা নিয়ে নে, ক্যাশ ডাউন, নো চক বিজনেস বাওয়া। একটু হেজিটেট্ করলাম। পঁচিশ টাকার টিকিট পঁচাত্তরে নেব—

পঁচিশ টাকার টিকিট পঁচাত্তর, এ তো খুব সস্তা রে গাড়োল।
।লার মত খেলা হলে দু টাকার টিকিটও একশ টাকায় বিক্রি হয়, তা
।নিস্। হয়েও ছিল।

ব্রজদার আওয়াজ পেতেই চার জোড়া চোখ পিছনে চাইলে।
জদা ততক্ষণে যদুবাবুর টেবিলের কাছে পৌঁছে গেছেন। আমি
সম্মানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ব্রজদা ধপাস করে বসে
ড়লেন। সুনীল বোস বারবার মুখ মুছতে লাগল।

একবার বললে, এইবার তাহলে পাখাটা খুলে দেওয়া যাক, নইলে
ঘমে বসা যাবে না।

ব্রজদা বললেন, তোমার গরমটা একটু বেশী হয়েছে দেখছি।
ানুয়ারী মাসে পাখা খুলে বন্ধুবান্ধবের বিপদ ঘটানোর চাইতে এই
লা একটা বিয়ে থা করে ফেল।

ব্রজদার কথায় বাঁকা বাঁকা ভাব দেখে আমি তাড়াতাড়ি বলে
ঠলাম, দু টাকার টিকিট একশ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। সে কি
খলায়?

ব্রজদা সহজ হলেন।

বললেন, যে খেলায় কলকাতায় টিকিট নিয়ে সব থেকে বেশি
াড়াকাড়ি হচ্ছে, সেই ক্রিকেট খেলায়। সাহেবরা সেবার বড় মুখ
রে বিলেত থেকে খেলতে এসেছিল তো, তা টীমটাও বড় সরেস
নেছিল জার্ডিন। ভারতে নেমে একটার পর একটা খেলায় জিতে
্যাটার সাহস বড় বেড়ে উঠেছিল. সেই জার্ডিন সাহেব কলকাতার
াঠে এক বাঙ্গালীর কাছে রাম প্যাদান খাচ্ছে, কথাটা লাখের আগে

মুখে মুখে ছড়িয়ে যেতেই ডালহৌসী স্কোয়ার খালি করে সাহেব মেমে
এসে ভিড় করল মাঠে। টিকিটের দাম না বেড়ে আর যায় কোথায়
সাহেবদের ঐ একটা অসাধারণ গুণ। খেলাধুলার ব্যাপারে নিতেটা
মত অত পুতু পুতু করে না। টিকিট একটা পেলেই হল, অ্যাট এ
দাম। কিনলেও তাই। লাঞ্চের আগে যারা দু টাকার টিকি
ঢুকেছিল, একশ টাকার নোট পেয়ে গেট পাস ঝেড়ে দিয়ে তারা গাছে
ডালে উঠে বসলে।

সুনীত ঘোষ ততক্ষণে নিজের কথা ভুলে গেছে।

উত্তেজনা চেপে জিজ্ঞেস করলে, কার খেলা দেখতে এত ভি
হয়েছিল ব্রজদা?

ব্রজদা একগাল হেসে স্নেহ ঝরিয়ে বললেন, সত্যিই তুই বড় বোক
নিতে। তোদের ব্রজদা ছাড়া একাজ আর কে করতে পারে? এ
সাদা কথাটা ধরতে পারলিনে?

সুনীল বোস বলে উঠল, আপনি আবার ক্রিকেটও খেলেছে
নাকি! কই জানতাম না তো।

ব্রজদা খপ্ করে প্রশ্ন করলেন, তোর ঠাকুর্দার বাপের নাম
বল তো।

সুনীল বিষম খেল। কিছুক্ষণ মাথা চুলকাল।

তারপর বোকার মত বললে, জানিনে।

অথচ ঔরঙ্গজেবের ঠাকুর্দার বাপের নামটি মুখস্থ করে রেখেছ
তোমার আর দোষ দেব কি, দোষ আমাদের জাতীয় শিক্ষার।

ব্রজদা একটু থেমে বললেন, আমাদের শিক্ষা তো নিজের লোকে
চিনতে শেখায় না। তাই তো ব্র্যাডমানের নাড়ি-নক্ষত্রও জান অথ
তোমাদের ব্রজদা যে ক্রিকেটে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে, পৃথিবীর কো

ক্রিকেটারই যার ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি, সে খবর তুমি, তুমি কেন, কোন বাঙ্গালীই জানে না। বাঙ্গালীর অধঃপতন কি সাধে হয়েছে!

বিরক্তি ছড়িয়ে ব্রজদা বললেন, দে যত্ন, একটা সিগারেট।

হুস করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ব্রজদা বোধ করি মেজাজটাই সাফ করে নিলেন।

বললেন, তবে শুনে রাখ, মাত্র তিন ওভারে সেঞ্চুরি করে শুধু ওয়ার্ল্ড রেকর্ডই করিনি, ক্রিকেট খেলার আইনকানুনে নতুন একটা প্রবলেমও সৃষ্টি করেছি। আজ পর্যন্ত তার সমাধান হয়নি। যদি কখনও লন্স পাস অরিজিন্যাল বৃটিশ ক্রিকেট ম্যানুয়ালখানা খুলে দেখিস। দেখবি "ব্রজদাস পাজল্" বলে একটা কথা তাতে আছে।

আমরা চারজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম, ব্রজদাস পাজল্! সে বস্তুটা কি?

ব্রজদা একটু নড়েচড়ে তারপর আবার স্থির হয়ে বসলেন। একেবারে যেন কাম্বোডিয়ার ধ্যানী বুদ্ধটি।

ধীর গম্ভীর গলায় আওয়াজ বেরুতে লাগল, যে বল ব্যাটের ঠুকুস খেয়ে মাঠের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে বাউণ্ডারি লাইন পার হয়, ক্রিকেট রুলে তাকে বলে বাউণ্ডারি, তার রান চার। আর যে বল ব্যাটের ঘা খেয়ে বাপ বাপ ডেকে তোল্লা হয়ে বাউণ্ডারি পেরোয়, তার নাম ওভার বাউণ্ডারি। তার রান ছয়, এসব নিয়ম তো দুধের ছেলেরাও জানে। কিন্তু ব্যাটসম্যানের হাঁকড়ানির চোটে যে বল বিপ বিপ করতে করতে স্পুটনিক হয়ে আকাশের বাউণ্ডারি পার হয়, তার রান কত? আর সে বাউণ্ডারির নামই বা কি? আজ পর্যন্ত তা ঠিক হয়নি, কারণ ক্রিকেটের জন্ম ইস্তক আকাশের বাউণ্ডারি পার করতে পারে এমন ব্যাটসম্যান একটাই জন্মেছে—

সুনীলং বোস মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ফেললে, তি
আমাদের ব্রজদা।

ব্রজদা কোন কথা না বলে নাকমুখ দিয়ে সেরেফ ধোঁয়া ছাড়ে
লাগলেন।

একটু পরে বললেন, কিন্তু একজনের জন্য তো আর রুল হয় না
তাই জার্ডিন সাহেব বলেছিল, ব্রজদা, তোমাকে গ্রেট বললে ছো
করা হয়, তাই ক্রিকেটে তোমার এই থার্ড ডাইমেনশন আর আনা
যাবে না, আমাদের চিরকাল বাউণ্ডারি আর ওভার বাউণ্ডারি নিয়ে
তুষ্ট থাকতে হবে। তবে তোমার যে মারে বল আকাশে মিলিয়ে যা
সেটা হিস্ট্রিতে ব্রজদাস্ পাজল্ বলে আবহমান কাল ধরে লেখা থাকবে

আগুনটা সিগারেটের একেবারে লেজে এসে ঠেকেছিল, তা
ব্রজদা তাড়াতাড়ি সুখটান মেরেই সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে
দিলেন। শুধু ঐ একটাই নয়, আরও আছে।

সুনীতের ডিউটি ছিল, উঠতে যাচ্ছিল, ও কথা শুনে ধপাস কে
বসে পড়ল।

ব্রজদা বলে চললেন, কথাটা যখন উঠলেই, তাহলে সব খুলে
বলি, জার্ডিনের দল যখন এল, ভারতের ক্রিকেট গগনে তখন সব চন্দ্র
সূর্যই বিরাজ করছেন, নাম আর কারও করব না। তোরা কাগজে
পুরনো ফাইল দেখে নিস। তবে এটাও সত্যি, ছোকরারা ফাই
দিয়েছিল ভাল। ইণ্ডিয়া হারছিল তবে রিয়েল স্পোর্টসম্যানের মত
হারছিল। আসলে যারা হারে, স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটা দেখাবার
চান্স তারাই কিন্তু পায়। এটা আমি বরাবর দেখেছি। জার্ডিনের দল

কলকাতায় এলে লাটসাহেব তাঁদের অনারে একটা পার্টি দিলেন। সেই পার্টিতে লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি কথায় কথায় আমাকে জাত তুলে একটু খোঁচা দিলে। বললে, ক্রিকেট তো সিভিলাইজড্ খেলা, রপ্ত করতে ইণ্ডিয়ার সময় নেবে। কি বল ব্রজদা? ন্যাশন্যাল স্পিরিটে ঘা লাগলে তোদের ব্রজদা ছেড়ে কথা কয় না, জানিস তো। বললাম, সাহেব, যা বললে আমাকে বললে। খবরদার একথা আর কাউকে বল না। একে সাহেব তায় লাটের খাস মুন্সি। তেরিয়া হয়ে বললে, কি বলতে চাইছ। বললাম, তোমার জার্ডিনের ভাগ্য ভাল বাঙ্গালীদের পাল্লায় পড়েনি। তাই মান-সম্মান বজায় রেখে দেশে ফিরতে পারছে! সাহেব বললে, তার মানে! বললাম, ঐ যা বললাম তার থেকেই বুঝে নাও। বাঙ্গালীদের খপ্পরে পড়লে তোমার ঐ জার্ডিনের এম সি সি একেবারে টেম সি সি হয়ে যেত। যদি সাহস থাকে, তোমার জার্ডিনকে বল না নেট প্র্যাকটিসের দিন আমাদের সঙ্গে এক হাত খেলে যাক। এমন সময় লাট-গিন্নী সেখানে এসে হাজির হলেন।

হ্যাল্‌লো ব্রজদা, বলে লাট-গিন্নী আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করলেন। তারপর একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? মাথায় যেন কোন মতলব ঘুরছে। বললাম, ম্যাডাম, তুমি চ্যারিটি করে রেডক্রসের জন্য টাকা তুলবে বলেছিলে, তা সেই ব্যাপারে আমার মাথায় এক আইডিয়া এসেছে। জার্ডিন সাহেবকে বল না, আমাদের সঙ্গে এক ইনিংস চ্যারিটি ম্যাচ খেলুক। তাতে তোমার টাকাও উঠবে আর ওদের নেট প্র্যাকটিসও হবে।

লাট-গিন্নী খুব খুশি। বললেন, ভেরী গুড আইডিয়া। ব্রজদা ইউ আর লাভ্লি।

ব্যস্, এক কথায় ঠিক হয়ে গেল। এম সি সি ভার্সাস গবর্নেসেস ইলেভেন।

যদুদা জিজ্ঞেস করলেন, গবর্নেসেস্ ?

ব্রজদা বললেন, গবর্নরস ওয়াইফ ইজিকলটু গবর্নেস। তার পরে এপস্ট্রপি এস্। নেস্ফিল্ডের গ্রামারখানা দেখে নিস। নে এখন শোন তারপর মাঠে তো নামলাম। ক্যালকাটা ক্লাবের মাঠে। খেলার শুরুতে ছিল গোটা কতক ক্লাব মেম্বার আর দিশি রাজা-মহারাজা খেতাবধারীর দল, মোস্ট অব দি মাঠ ফাঁকা। তেমন টিকিট বিক্রি হল না দেখে লাট-গিন্নী একটু মনক্ষুণ্ণ হলেন। যা হোক খেলা শুরু হল। তাড়াতাড়িতে টীম যোগাড় করেছি। উইকেট-কীপার অব্দি নেই। জার্ডিনের লাকটা ভাল টসে জিতে ব্যাটিং নিলে। কি আর করি, আমিই স্টাম্পের পিছনে দাঁড়ালাম। একটার পর একটা ছোকরাকে বল করতে ফিল্ডে পাঠাই আর জার্ডিনের ব্যাটসম্যানরা তাকে পেঁদিয়ে বিন্দাবন পাঠায়। একশ বারো মিনিটে ওরা পঁচানব্বই ফর নো উইকেট করলে। বেইজ্জতির একশেষ। আমি আর থাকতে পারলাম না। একটা আনাড়িকে প্যাড পরিয়ে উইকেট কিপিং-এ পাঠিয়ে নিজেই বল হাতে নিলাম। জানিস তো আমি দু হাতেই বল করতুম। ডান হাতে ফাস্ট বল দিতুম আর বাঁ হাতে স্পিন। কার সাধ্যি খেলে। যা হোক, ওভারের প্রথম বলেই লেগ ব্রেক। ব্যাটসম্যানের ডান পায়ের প্যাডে ঠক করে বলটা লাগতেই সে ব্যাটা ওফ্ ফাদার বলে ক্রীজের উপর শুয়ে পড়ল। হেঁটে আর প্যাভিলিয়নে যেতে পারলো না। রিয়েল লেগ ব্রেক কিনা।

সেকেণ্ড বল দিলাম গুগলি। অফ স্টাম্প ছিটকে পড়ল। পর পর দু বলে দুজন আউট হতেই দেখলাম গ্যালারির সবাই নড়েচড়ে বসল। মৃদু হাততালিই পড়ল। কিছুক্ষণ পরে দেখি জার্ডিন হোঁৎকা মতন এক ব্যাটসম্যান পাঠিয়েছে, সে তো বেশ পোজ নিয়ে ক্রীজে ব্যাট-ট্যাট ঠুকে খুঁটি গেড়ে দাঁড়ালে। দেখেই বুঝলাম ব্যাটা খুব তুখোড়। শুধু গুগলিতে কাবু করা যাবে না, বড় শামুক লাগবে। ব্যাট ধরা দেখেই বোলাররা বুঝতে পাবে, ব্যাটসম্যানদের দুর্বল স্থানটা কোথায়। দেখলাম বেটা পা দিয়ে লেগ স্টাম্প কভার করেছে আর ব্যাট দিয়ে অফ আর মিডলস্টাম্প। পর ওর দুটো বল কোন ক্রমে ঠেকিয়েও দিলে। নো রান, ঘাঘু ব্যাটসম্যান, মার দেখেই বুঝলাম। আচ্ছা বাবা, তুমি যদি বুনো ওল তো আমি, এই ব্রজরাজ কারফর্মাও, হলাম গে বাঘা ট্যামারিন। কুড়ি স্টেপ পিছিয়ে গেলাম, তারপর ঝড়ের গতিতে ছুটে এসে এক্সট্রা ফাস্ট বলের সঙ্গে লেগ স্পিন মিলিয়ে অফ স্টাম্পে ঝুলিয়ে দিলাম ছুঁড়ে। চোখের পলক না পড়তে সিলি মিড অফে বলটা ড্রপ খেয়েই তীব্র গতিতে মোড় নিয়ে লেগ স্টাম্পের দিকে বোঁ করে ঘুরে গেল। পরমুহূর্তেই দেখলাম বাছাধন লাট্টুর মত পিনপিন করে স্পিন খেতে খেতে সর্ট ফাইন লেগে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। ঐ স্পিন কি আটকান সোজা কথা! ব্যাটসম্যান নিজেই স্পিন করে গেল। আর বলটা ব্যাটের কোথায় ঠেকে গালিতে ইজি ক্যাচ তুলে একেবারে ফিল্ডারের বুক পকেটে ঢুকে পড়ল। টিপখানা দেখেছিস আমার। ক্যাচ মিস করা আমাদের জাতীয় অবেস কিনা, তাই কোন রকম রিস্ক নিলাম না। তারপর ওঃ, সে কি হাততালি। আমার প্রথম ওভারের রেজাল্ট হল থ্রি উইকেট্স-নো রান।

ওয়াটার রিসেস হতেই জার্ডিন সাহেব, লাট-গিন্নী ছুটে এসে আমার

সঙ্গে সে কি হ্যাণ্ডসেক। প্রাইভেট সেক্রেটারি লাট-গিন্নীর আদেশে লাটসাহেবকে ফোন করতে ছুটলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে রটে গেল জবর খেলা শুরু হয়েছে, মাঠে ভিড় বাড়তে লাগল। বাইরে গুঁতো-গুঁতি। নিমিষের মধ্যে সব টিকিট নিঃশেষিত। গেট পাস নিয়ে ব্ল্যাক শুরু হল! সে এক এলাহী কাণ্ড।

লাঞ্চের আধ ঘণ্টা আগেই কোন রান অ্যাড না করে জার্ডিনের দল ঐ পঁচানব্বইতেই আউট হয়ে গেল। স্কোর বোর্ডের বোলিং এনালিসিসটা দিচ্ছি, তার থেকেই রেজাল্টটা জানতে পারবি। বি কার-ফর্মা সেভেন ওভার ফাইভ মেডেন নো রান টেন উইকেট্‌স।

সুনীল ফস করে বলে উঠল, তা আবার কি করে হয়। এই বলছেন নো রান, আবার বলছেন সেভেন ওভার, ফাইভ মেডেন।

ব্রজদা বললেন, তোদের কাছে হয় না, ব্রজর হাতে সবই হয়। এখন শোন। বকবক করিসনি।

আমরা এবার ব্যাট করতে নামলাম। লাঞ্চের আগে মাত্র তেইশ রানে আমাদের চারটে উইকেট ঝপ ঝপ করে পড়ে গেল। লাঞ্চের পরে মাত্র সাত রান হতে আরও একটা পড়ল। সিক্‌স্‌থ ম্যান নামলাম আমি। ওদের বাঘা বোলারকে ফেস করলাম। সে বল ছুঁড়লে, সেটা ছিল ইন সুইঙ্গার। বল মাটিতে পড়ার আগেই দৌড়ে গিয়ে সর্ট লেগ থেকেই মারলাম একখানা ছয়। বল মাঠ পেরিয়ে লাট-সাহেবের বাগানে গিয়ে পড়ল। নতুন বল আনা হল। ঘসে ঘসে তার রঙ চটিয়ে বোলার আবার ছুঁড়লেন। অফ ব্রেক। মাথার উপর দিয়ে প্যাভিলিয়ানের ছাতে পাঠিয়ে দিলাম। আবার ছয়। ফার্স্ট ওভারের [illegible] বলেই আমার ছত্রিশ রান হল। নেকস্‌ট্‌ ওভারে মাত্র দুই রানে আমাদের আরও একটা উইকেট পড়ে গেল। তার পরের

ওভারে আমি আবার ছাত্রিশ রান করলাম। আমার বাহাত্তর রান নিয়ে মোট রান হল একশ চার ফর সিক্স! পরের ওভারে একেবারে কেলে-ঙ্কারি। কোন রান না হতেই আরও একটা উইকেট গেল। তারপর আমি আবার ফেস করলাম। বোলার প্রবল বিক্রমে ছাড়লে একটা বাম্পার। আমিও ঝাড়লাম জাম্পার। আমার সঙ্গে চালাকি! লাফিয়ে উঠে এইসা এক তাড়ু মার মারলাম যে বল সোজা উপরে গিয়ে আকাশের নীলিমায় একেবারে বিলীন হয়ে গেল। পুরো দশ মিনিট সকলের চোখ উপরে। রিপোর্টারের কলমে কালি সরল না, ফটো-গ্রাফারদেব ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলল না। সব হাঁ হয়ে গেছে। মাঠে পিনড্রপ সাইলেন্স। শুধু খুব দূর থেকে, বোধ হয় সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারার কোলের কাছ থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেতার তরঙ্গে ভেসে উঠতে লাগল। বিপ্ বিপ্ বিপ্। তোরা আজকালকার ছোকরা কীথ মিলারের মাঠের বড়াই করিস। আরে আমি ছিলাম মিথ কিলার।

হ্যাঁ, তারপর শুরু হল ক্ল্যাপিং। অবিচ্ছিন্ন ধারায় হাততালি পড়তে লাগল। তারপরে সমস্যা হল, এইবারে কত রান দেওয়া হবে। এটা কি বাউণ্ডারি, না ওভার বাউণ্ডারি, না সুপার বাউণ্ডারি. না কি। পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করা হল বলটা পড়ে কিনা দেখার জন্য। কিন্তু কোথায় বল। যাক, শেষ পর্যন্ত ব্রজদাস পাজল্ নাম দিয়ে ওভার বাউণ্ডারির পয়েন্টই লিখলে।

খেলাও আবার শুরু হল। নেকস্ট বলে আরেকটা পাজল্. সেটা আরও মোক্ষম। না, এবার আর আকাশে নয়, মারের চোটে বলটা ফট করে নারকোলের মালার মত দু টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল। অর্ধেকটা একজন ফার্স্ট স্লিপে ক্যাচ ধরে ফেললে আর বাকি অর্ধেকটা ওভার বাউণ্ডারি হল। আবার খেলা বন্ধ করে কনফারেন্স বসল। কি করা হবে

এখন। আমি কি আউট হয়েছি, না ছয় মেরেছি? ফয়সালা আর হয়ই না। খেলতে গিয়ে বারবার এই ডিস্টার্বেন্স। কার ভাল লাগে বল। এদিকে তখন আবার আমার ইভনিং ডিউটি। সময় হয়ে গেছে। দুত্তোর বলে ব্যাট ফেলে দিয়ে অফিসে চলে এলাম। পরে শুনলাম, জার্ডিন সাহেব নাকি বলে গেছেন, ইণ্ডিয়া একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দলকে হারাবে। ঐ এক খেলাতেই তাঁর চোখ ফুটেছিল, বুঝলি।

মনে না পড়লেই ভাল হত

হিমানীশ গোস্বামী

হাসপাতালেই আমার জ্ঞান হল—যেভাবে অনেক গোয়েন্দারাই হাসপাতালে জ্ঞানলাভ করে থাকেন। তবে প্রথমেই আমি বুঝতে পারিনি আমি হাসপাতালের খাটে শুয়ে আছি। সেটা বুঝতে পারলাম পরে। প্রথমে একটা আচ্ছন্ন এবং সিকি জাগরণ ভাব। একটা বেকায়দা অবস্থা। তারপর আস্তে, আস্তে আধা জাগরণ আধা অজ্ঞান ভাব। তারপর চোখে পড়ল আমার খাটের উপর একটা বৈদ্যুতিক পাখা। পাখাটা ঘুরছে না। খুব সম্ভবত বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ। গরমে আমি ঘেমে গিয়েছি। বালিশ ভিজে। কিন্তু তখনও আমার ধারণা আমি আমার বাড়িতেই শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে ভাবছি হাওয়ার অভাবে জীবিত ব্যক্তি, ছুঁচো অথবা শিলিগুড়ি ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক যেমন ছটফট করে যদি পাখাটা তেমন ছটফট করত তা হলেও তো তদ্দরুন কিছু হাওয়া মিলত। কিন্তু পাখারা ওসব কিছু বোঝে না। বিদ্যুৎ হাওয়া হয়ে গেলে পাখারাও হাওয়া দিতে ভুলে গিয়ে বেড়ালের মত চুপসে যায়। আর তখন আমি প্রার্থনা করলাম, কাকে কে জানে

একটু বিদ্যুৎ দাও, পাখাটা নড়ে চড়ে উঠুক—এত গরম সহ্য হয় না।

তবে তখনও আমার ধারণা আমি আমার নিজের খাটেই শুয়ে আছি। আমাকে যে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল তা আমার আদবেই স্মরণে নেই। তা আমার স্মৃতি থেকে অন্তর্হিত। আমাকে কেন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল ? আমার হয়েছে কি ? কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম আমি কোথায় ? এবার চোখে পড়ছে এদিক ওদিক দু একটা নার্সের আনা-গোনা, দু একজন রোগীর আর্তনাদ, দু পাঁচজন রোগীর'নাকের ডাক—ঘোর সকালেই ওদের নাক ডাকছে দেখে এবং শুনে মনে হল ওদেব দ্বারা জীবনে কিচ্ছু হবে না। সকালে ঘুম থেকে ওঠো, আব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড় তবেই না তুমি হতে পারবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ধনী এবং জ্ঞানী। আর এই সময়—তা মনে হল বেলা নটা-টটা হবেই এরকম নাক ডাকানো তাও যখন চারদিকে গরম হাওয়া এবং পাখাটা পর্যন্ত ঘুরছে না এরকমভাবে প্রবাদবাক্য অবহেলা করাটা কি উচিত ?

তখনও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি আমি হাসপাতালেই রয়েছি। তবে লোহার খাটে শুয়ে থাকায় এবং খাটটা লোহার বলে বুঝতে পারায় আমার সন্দেহ হয়েছিল এটা হাসপাতাল না হয়ে যায় না। তারপর আমার খাটের তলা থেকে একটা কুকুরের কেঁউ-কেঁউ শুনে এবং অন্য একটি খাটের তলায় একটি কুকুরকে একটা থালা থেকে দুটো টোসট খেতে দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এ হাসপাতাল না হয়েই যায় না, কেননা আমি তিন দিন আগেই খবরের কাগজে পড়েছিলাম হাস-পাতালে কুকুরের উপদ্রব।

তা হলে আমি হাসপাতালেই আছি ! এটা বুঝবার পর আমি বুঝতে চেষ্টা করলাম আমার হয়েছে কি ? আমি আমার মাথায় হাত

দিলাম। না ওখানে ব্যানডেজ-ট্যানডেজ নেই। পায়ে হাত দিলাম, পায়ে কোনো ব্যানডেজ নেই। যাক বাঁচা গেল—মাথায় পায়ে কিছু হয়নি। হাত দুটিও ভাল কবে পরীক্ষা করলাম, কিন্তু সেখানেও কোনো খুত চোখে পড়ল না, কেবল মনে হল আমার ডান হাতের তেলোতে একটা আঁচিল রয়েছে। কিন্তু সে জন্য আমাকে হাসপাতালে এনে কেউ খাটে শুইয়ে দিয়েছে তা সম্ভবপর বলে মনে হল না। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে হাই তুলতে যাব মাঝপথে হঠাৎ দারুণ এক বাধা পেলাম। এই যে আমি এই খাটে শুয়ে আছি এই আমিটি কে? অনেক চেষ্টা করেও আমার নামটাকেই মনে আনতে পারলাম না। আমি নিশ্চয় বহু মানুষের নাম মুখ-চোখ, হাত-পা, এবং সেসব মানুষের বাপেদের নাম ভুলে গিয়েছি, কিন্তু নিজেব নাম ভুলে যাওয়ার বিষয়টি এই প্রথম বলে মনে হল? আমি যে কে সেটা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। একটু মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম আমার খাটের সঙ্গে যে চার্ট রয়েছে তাতে কার নাম লেখা রয়েছে? অনেক চেষ্টা চরিত্র করে দেখলাম বিশ্রী হাতের লেখায় কে যেন লিখে রেখেছে আননোন, অর্থাৎ কিনা অজ্ঞাত। আর তখনই মনে হল দুস শালা কেবল যে আমিই আমার নাম জানি না তা নয়—এত বড় একটা হাসপাতালের কেউই সে কথা জানে না। এ তো মহা মুশকিলের ব্যাপাব।

আমি উঠে বসলাম। উঃ এত ঘামও বেরুচ্ছে সমস্ত গা দিয়ে।

আমি উঠে বসতেই একজন নার্স হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে ক্যাথারিন দি গ্রেটের মতো ভঙ্গীতে বলে উঠল, খবর্দার—আপনাকে ঘুমের ওষুধে রাখা হয়েছে, একটুও জাগবার চেষ্টা করবেন না। আমি বললাম, আমি তো দিব্যি ঘুমুচ্ছিলাম কিন্তু পাখা ঘুরছে না বলেই তো জেগে উঠতে বাধ্য হলাম।

নার্সটি বলল, ওসব ইয়ার্কি-টিয়ার্কি ভাল লাগে না—আপনাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে আপনি চুপটি করে ঘুমিয়ে থাকুন ব্যস, আমাদের জ্বালাবেন না। ষাটটা বেড আর তার জন্য বরাদ্দ দুজন নার্স। খাটতে খাটতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।

আমি বললাম, শুনুন—আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগছে। আপনি যদি না শোনেন তা হলে আমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে মরে যাব।

নার্স বলল, সে এক কেলেঙ্কারি হবে। ও কম্মটি করবেন না। নার্স ঘড়ি দেখে বলল, আর দেড় ঘণ্টা পর আমার ডিউটি ওভার হয়ে যাচ্ছে, তারপর অবশ্য লাফাতে টাফাতে পারেন। তবে আপনাকে বন্ধু হিসেবে একটা উপদেশ দিই, এটা দোতলা, জানালা থেকে মাটি ফুট চোদ্দ পনেরো হবে। যদি শিওর হতে চান তো পাঁচতলার ছাদ থেকে লাফানাই সবচেয়ে ভাল। আর অতদূর উঠতে খুব কষ্ট-টষ্ট হয় তা হলে চারতালার জানালা থেকেও লাফাতে পারেন। তবে এখন নয়, আমার ডিউটির পর। দোতলা থেকে লাফিয়ে শেষে হয়ত কাজের কাজটাই হবে না—মাঝ থেকে হাত কিংবা পা ভেঙে সারা জীবন ধরে পঙ্গু হয়ে থাকবেন, সেটা কি ভাল হবে?

আমি বললাম, না। আপনি খুবই দয়ালু। খুবই লজিক্যাল কথাবার্তা বললেন। কিন্তু নার্স, আমার একটি বিরাটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই যে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি—কিন্তু আমি অর্থাৎ আমি যে কে তা আমার মনে পড়ছে না। নার্স, আমি বাংলায় কথা বলছি বলে আমার মনে হচ্ছে আমি বাঙালীই হব। আপনি কি বলেন?

নার্স বলল, দাঁড়ান আমি আর একটা ইনজেকশন দিয়ে দিই। আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন।

আম বললাম, অবশ্য অনেক মেড়ো, মানে মাড়োয়ারী কিংবা গুজরাটী, কিংবা পানজাবী এঁরা দিব্যি বাংলা কথা বলেন। আচ্ছা হয়ত আমি একজন মাড়োয়ারী। হতেও তো পারি, নাকি পারি না?

নার্স বলল, দাঁড়ান আমি ডাক্তারবাবুকে খবর দিচ্ছি।

আমি বললাম, কিংবা আমি একজন মুসলমানও তো হতে পারি। পারি কি পারি না? কিংবা বুদ্ধিস্ট, কিংবা জৈন।

নার্স আমার কথা আর না শুনে চলে গেল।

আমি দেখলাম জানালার উপর দিয়ে একটা বেড়াল হেঁটে যাচ্ছে আর আমাকে দেখছে।

আমি মনে মনে ভাবলাম এটা কেমন করে হল? এই জায়গাটিকে হাসপাতাল বলে ঠিকই আমি ধরেছি। নার্সকে নার্স ঠিকই মনে করেছি, বেড়ালকে বেড়াল, আর ঐ যে আকাশ, ওটাকে তো আমি আকাশই ভাবছি। এত সব ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে অথচ আমি কে সেটা বুঝতে পারছি না।

আমার মস্তিস্ক কাজ করছে না? না, কিছুটা কাজ করছে—কিছুটা নয়। মস্তিষ্কের লোডশেডিং আংশিক—তাই হয়েছে। কিন্তু আমার নাম কি? আমি হাসপাতালেই বা এলাম কেন? আবার লোহার খাটে টাঙানো চার্ট দেখবার চেষ্টা করলাম। তাতে লেখা রয়েছে পসিবল কনকাশন অফ ব্রেন মে বি এপিলেপটিক কনভিশন। আমার হয়েছে কি? আমি কে? আমাকে ওঁরা হাসপাতালে এনেছে কেন?

আমি এখানে থাকব না। আমি চলে যাব।

পরক্ষণেই ভাবলাম, আমি যাব যে, কোথায় যাব?

এবং আবার সেই ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল—আমি কে?

বড় কঠিন প্রশ্ন। বড় কঠিন।

বেড়ালটা জানালা থেকে লাফিয়ে ঘরে ঢুকল।

আচ্ছা, আমার মনে হল—আমি বেড়াল নই, কুকুর নই। আমি পাখা নই—আমি মানুষ।

—তা যদি হয়, আমি ভাবলাম, এতো খানিকটা এগুনো গেল। আমি মানুষ। আমার বয়স ? কে জানে আমার বয়স কত ? তবে আমি যে শিশু নই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার বয়স কি আঠারো, না পঁচিশ ? নাকি পঁচাশি ! আমি কি বিবাহিত ? আমার কি স্ত্রী জীবিত ? আমার ঠিকানা কি ?

আমি কি বড়লোক ?

নানা রকম প্রশ্ন মাথায় আসছে। উত্তর পাচ্ছি না। তবে এত-গুলো প্রশ্ন আসছে কেন ? সেটাই বা কেমন করে হচ্ছে ?

আমি মানুষ। আচ্ছা, আমি কি শিক্ষিত ?

শিক্ষিত তো বটেই। এই যে স্পষ্ট চার্টে পড়তে পারলাম ইংরিজীতে লেখা কতগুলি কথা।

আচ্ছা, আমি যদি শিক্ষিত হই, তাহলে কতখানি শিক্ষিত ?

মহা ঝামেলায় পড়লাম তো !

একটু পরে একজন ছোকরা ডাক্তার এসে আমাকে বলল, করেছেন কি মশাই. উঠে বসে বিড়বিড় করে কি সব বকছেন ? আপনাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে আপনি ঘুমিয়ে থাকুন।

আমি বললাম, দেখুন মশাই আমার একটা বিরাট সমস্যা উপস্থিত হয়েছে।

ছোকরা ডাক্তার একটা টুল নিয়ে আমার কাছে বসে পড়ল। বলল, কী সমস্যা বলুন।

আমি বললাম, মশাই—আমি কে বলতে পারেন ?

ছোকরা ডাক্তার বলল, উঁহু। আপনি কে আপনি তো নিজেই বলতে পারবেন। আমি বললাম, আমার কিছুই মনে পড়ছে না। আচ্ছা, আমার বয়স কত হবে আন্দাজ ?

ছোকরা ডাক্তার বলল, সেটা মোটামুটি বলা যায়—অ্যাবাউট থারটি।

আচ্ছা, আমি আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করি, আমি কি বড়লোকের ছেলে ?

এবারে সে আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। প্রায় এক মিনিট ধরে দেখল সে, তাররর বলল, নাঃ কস্মিনকালেও না। অপুষ্টি আপনার সমস্ত শরীরে চিহ্ন রেখেছে। চোখের চশমার পাওয়ার প্লাস চার হবে, আর আপনার জামাতে দুটো তালি মারা। চোখে ক্ষুধার্ত একটা ভাব। আপনি বড়লোকের ছেলে হতেই পারেন না।

এক কথায় আমি খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম। বললাম, তাহলে মনে হচ্ছে আমি গরীবই হব।

ছোকরা ডাক্তার আমাকে সান্তনা দিয়ে বলল, খুব গরীব হয়ত নন আপনি। যখন আপনাকে আনা হয় তখন আপনার পকেটে আধ প্যাকেট সিগারেট ছিল। আবার একটা সিগারেট ছিল আধপোড়া—নিবিয়ে রেখেছিলেন পরে টানবেন বলে। অর্থাৎ সিগারেট-টিগারেট কেনার পয়সা জুটত, কিন্তু আবার পয়সাও বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন: এছাড়া আপনার পকেটে পাওয়া গেছে পাঁচ টাকার একটা নোট, আর কিছু খুচরো পয়সা। এতে মনে হয় আপনি একেবারে গরীব নন।

ডাক্তার বলল, আপনি এক কাজ করুন। চুপচাপ শুয়ে থাকুন। একটু পর ব্রেকফাস্ট আসবে, খাবার চেষ্টা করুন। একটা টোস্ট,

একটু দুধ, একটা পোচ আপনার শরীর খুবই দুর্বল। সাড়ে তিন দিন আপনি অজ্ঞান হয়েছিলেন একটু জোর দরকার।

বলে ডাক্তার উঠে দাঁড়াল।

আমি বললাম, ডাক্তার—আমার অবস্থা খুবই খারাপ বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি ঐ ডিমটা খেতে পারব না।

ডাক্তার বলল, কেন ?

আমি বললাম, আমি যদি ডিমটা খাই তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু পরে যদি জানতে পারি আমি একজন ভেজিটেরিয়ান তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে না ?

ডাক্তার বলল, তাহলে দুধ আর রুটি খান। পরে যখন মনে পড়বে আপনি কে তখন না হয় ডিম-টিম খাবেন।

মনে হল একথা বলার সময় ডাক্তার মুচকি হাসি হাসতে গিয়েও গম্ভীর হয়ে গেল।

আমি বললাম, পরে আমার সব মনে পড়বে ?

ডাক্তার বলল, নাইনটি পারসেন্ট চান্স। আপনার সব কথাই মনে পড়বে। অর্থাৎ আপনার নাম, ঠিকানা, বয়স আপনি বড়লোক না গরীব। তবে একটু সময় নেবে। আপনাকে রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল—রাত তখন নটা হবে, আমি নাইট ডিউটিতে ছিলাম। চারজন লোক একটা ট্যাকসিতে করে আপনাকে নিয়ে আসে।

আচ্ছা ডাক্তার। আমি ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলাম।

—বলুন।

—আচ্ছা, আপনি একটা কথা বলুন তো আমি বাঙালী তো ?

ডাক্তার বললেন, বাঙালী নিশ্চয়ই আপনি বাঙালী।

—আচ্ছা ডাক্তার, আমি হিন্দু তো?

ডাক্তার বলল, আপনি হিন্দু ব্রাহ্মণ। আপনার গায়ে একটা চমৎকার পৈতে ছিল।

আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক বাবা বাঁচা গেল, মুসলমান হলে নামাজ-টামাজ পড়তে হত, খ্রিষ্টান হলে গির্জার খোঁজ করতে হত। আমি হিন্দু জানতে পেরে খুব খুশী হলাম। বললাম, ডাক্তার আপনি সত্যিই একটা সুসংবাদ দিলেন।

ডাক্তার নার্সকে ডেকে কি সব ওষুধ-টষুধের কথা বলল। নার্স আমার কাছে এসে দুটো বিশ্রী দেখতে ট্যাবলেট আমার মুখের মধ্যে প্রায় জোর করেই দিয়ে দিল। তারপর ব্রেকফাস্ট এল। আমি ডিম ছাড়াই ব্রেকফাস্ট খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আর আমারই নাক ডাকা আমিই যেন শুনতে লাগলাম। ঐ ট্যাবলেট দুটো নিশ্চিত ঘুমের।

ঘুম ভাঙলো সেই বিকেলে। পাখা চলছে তখন বনবন করে। আমার পাশের খাটে একজন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বুড়ো রোগী আমাকে চিঁচিঁ করে বলল, লোকেরা বলছে আপনি নাকি বাপের নাম ভুলে গেছেন? বলে খ্যাকখ্যাক করে হাসতে লাগলেন।

আমি হ্যাঁ না এই দুইই হয় এমন উত্তর দিলাম। মনে মনে ভাবলাম খচ্চর লোকটা এমন করে খ্যাঁকশেয়ালের মত হাসে কেন? হাসির কি আছে? একজন লোক কত কিই তো ভুলে যায় জীবনে। কত কী। বাপের নামও লোকে ভোলে। ভুলতেই পারে। তাতে ইয়ার্কির কি আছে?

লোকটা বলল, শুনুন—আপনার কথা আমি শুনেছি। সব ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছেন। চমৎকার। কিছু মনে রাখার দরকার নেই। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে চলে যান সোজা মহাবলীপুরম কিংবা

মিজোরাম। নতুন জীবন শুরু করুন গিয়ে, কিন্তু বিয়ে-টিয়ে করবেন না।

আমি বললাম, কী সব যা-তা বলছেন ?

লোকটা বলল, আমার বাঁ পায়ের দুটি আঙুল খ্যাঁচ করে কেটে দিয়েছে কে জানেন ? আমার বড় ছেলে। এই দেখুন কি বিরাট ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সারতে লাগবে পাক্কা দুমাস। আমার বাঁ হাতখানা ফ্র্যাকচার হয়ে রয়েছে, সারতে লাগবে তিনমাস। এটা আমার ছোট ছেলের কীর্তি। আর এই যে মাথার ব্যাণ্ডেজ দেখছেন, এটা আমার স্ত্রীর হাতের কাজ। একটা ঘটি ছুঁড়ে মেরেছেন তিনি। বলে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল।

আমি বললাম, কেন ওরা সব আপনাকে মারল ? আপনার অপরাধ

বুড়ো এবার খিকখিক করে হাসতে লাগল আর বলতে লাগল আমার অপরাধ নয় ? দুমাস আগে আমি রিটায়ার করে অফিস থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা পাই চুয়াত্তর হাজার টাকা, আর দুটো ইনশিওর ম্যাচিওর করে তাতে পাই ছত্রিশ হাজার টাকা। কত হল ?

আমি বললাম, এক লক্ষ দশ হাজার।

বুড়ো বলল, ঐ টাকা আমি পেয়েছি বাড়ির কাউকে না জানিয়ে পোস্ট অফিসে আর ব্যাংকে ফিকসড ডিপোজিট করে রেখে দিয়েছি ব্যাংক থেকে পাই মাসে আড়াই শো—ব্যস্ আসল টাকাটায় হাত পড়বে না, আর পোস্ট অফিস থেকে প্রত্যেক পুজোর আগে থোক টাকা পেয়ে যাব বুঝলেন, কিন্তু দুই ছেলে আর বউ ক্রমাগত আমাকে বলতে লাগল প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের আর ইনশিওরের টাকা তাদের হাতে দিতে হবে। আর আমিও তাদের বলেছি, হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয়। বলে বুড়ো উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়ল। বলল, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

আমি বললাম, কেন ?

বুড়ো বলল, ছেলেরা টের পেয়ে গেল আমার মতলব দিন সাতেক আগে। তারপর থেকে শুরু হল আমার উপর অত্যাচার। সে সব কথা তো আগেই বলেছি। তাই বলছিলাম কি, সব ভুলে গিয়ে ভালই করেছেন। আমিও এই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আর বাড়িতে ঢুকছি না। ঠিক করেছি মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টকে বা হিমালয়ের কোথাও গিয়ে সাধু-টাধু হয়ে থাকব। আর ইচ্ছে করলে আপনি আমার সঙ্গে থাকতে পারেন চ্যালা হয়ে। বলে বুড়ো আবার হাসতে লাগল আর বলতে লাগল, হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরবেন না বুঝলেন ! লোকটা বোধ হয় পাগল।

পাগল নিশ্চয়ই। নইলে সে তো জানে আমি সবই ভুলে মেরে দিয়েছি, অথচ সে বলে কিনা হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরবেন না। যেন ইচ্ছে থাকলেও আমি বাড়িতে ফিরতে পারব। আমি যে কে, তাই তো আমি জানি না—তা আবার আমার বাড়ি। হয়ত সাধু-টাধুই হয়ে যেতে হবে নিজের নাম জানতে না প্যারলে। আবার মনেও পড়ে যেতে পারে সব। ছোকরা ডাক্তার তো বলেইছে নাইনটি পারসেণ্ট চান্স সব মনে পড়ে যাওয়ার।

ডাক্তার ঠিকই বলেছিল। আজকালকার ছোকরা ডাক্তার হলে কি হবে, দু পাঁচটা কথা তারা ঠিকই মিলিয়ে দেয়। আমার আস্তে আস্তে দু-একটা কথা মনে পড়তে লাগল। তবে খুব যে স্পষ্টভাবে তা নয়। একবার মনে হল আমার নাম নিমাই হালদার। হ্যাঁ—ঠিকই, মনে পড়ল আমার নাম নিমাই-ই হবে। কিন্তু দু মিনিট পর মনে হল, নিমাই হালদার বলে একজনকে আমি চিনতাম তার বড় বড় গোঁফ ছিল, কিন্তু আমার নাম, সুবীর ভাদুড়ী। হ্যাঁ আমার নাম সুবীর ভাদুড়ীই।

কিন্তু ঐটুকুই মনে পড়ল। কিন্তু তাও সবটা নয়। আমার বাড়ি কোথায়, বাপের নাম, ঠিকানা, বিবাহিত কিনা এসব একদম মনে পড়ল না।

বিকেলের দিকে পাশের খাটের বুড়ো ভদ্রলোককে বললাম, কী করা যায় বলুন তো ?

বুড়ো বলল, একটা গণককে দেখান মশাই, ওরা আপনার অতীত ভবিষ্যৎ তো বলে দিতেই পাবে, এমন কি বর্তমান পর্যন্ত তাদেব নখদর্পণে।

আমি বললাম, বলেন কি মশাই—বর্তমান পর্যন্ত বলে দিতে পারে?

বুড়ো বলল, তবে আর বলছি কি। এ রকম গণক অবশ্য লাখে একটা মেলে, কিংবা হয়তো মেলেও না। আমার এক শালা এরকম একজন গণককে চেনে, বলেন তো শালাকে একটা চিঠি লিখে দিই ?

আমি বললাম, সে তো বেশ ভাল কথা।

বুড়ো বলল, একটা পোস্ট কার্ড হবে ?

আমি বললাম পোস্টকার্ড কোথায় পাব এই হাসপাতালে ?

বুড়ো বলল, ঠিক আছে—আমি ব্যবস্থা করছি। বুঝলেন মশাই এই কলকাতা শহরে টাকা দিলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়, পোস্টকার্ড মিলবে না ? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন দু তিনদিনের মধ্যেই আমার শালা গণক নিয়ে হাজির হবে।

কিন্তু গণক আর আনতে হল না।

সন্ধ্যেবেলা আমার মনে পড়ল আমার নাম রবীন ভট্টাচার্য। আমি থাকি বেলেঘাটা মেইন রোড থেকে বেরিয়ে ডানদিকে গিয়েছে এমন একটা সরু গলির তৃতীয় বাড়ির একতলায়।

আমার মনে পড়ল আমি দু বছর হল বেকার। বাবা রিটায়াব

করেছেন—এখন তাঁর জমানো টাকার সুদ থেকে আয় মাসে দুশো টাকা। আমার উপরই সংসারের ভার। আমার সংসার, অর্থাৎ আমি, বাবা, মা এবং দু বোন। আমার বর্তমান আয় হল পাঁচটা ছাত্র পড়িয়ে শ'চারেক টাকা মাসে।

না, বলার মত কিছু নয়। তবে এ সবই মনে পড়ে গেল। এও মনে পড়ে গেল আমি কিভাবে হাসপাতালে এলাম, কিংবা এটাও বলা যায় আমাকে কিভাবে হাসপাতালে আনা হল।

মনে পড়লে এখনও হাসি পায়।

আমি দিন কুড়ি আগে একটা চমৎকার ছাত্র পড়ানোর কাজ পেয়েছিলাম। চমৎকার এই জন্য যে ছাত্রটি মেধাবী। যা বলে দিই তাই ঠিক ঠিক বুঝে নেয়। সন্ধ্যেয় সপ্তাহে দু ঘণ্টা করে তিন দিন। এর জন্য আফজলের বাবা আমাকে দেবেন বলেছিলেন দুশো টাকা।

আমি একদিন পর পর যাই আফজলের বাড়ি। জায়গাটা পার্ক সার্কাস ট্রামডিপোর পেছনে একটা গলির মধ্যে। সেখানে সাড়ে সাতটায় পৌঁছানোর চেষ্টা করি। কখনো ঠিক সময়ে পৌঁছে যাই, কখনো বা দেরি হয়ে যায় দু তিনটা ভীড় বাস ছেড়ে দিয়ে যেতে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আমি বাস থেকে নেমে যেমনি আফজলের' গলির মধ্যে ঢুকতে যাই ঠিক সেই সময় হুস করে সব আলো টালো নিবে যায়। অর্থাৎ লোডশেডিং শুরু হয়।

এরকম পাঁচদিন হওয়ার পর মোড়ের বিড়িওয়ালা একদিন হঠাৎ আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠল—বলল, ঐ যে সেই শালা।

আমি তো অবাক।

একজন বিড়িওলা আমাকে শালা বলছে, ভাবা যায় না।

আমি বললাম, কী বললে তুমি, অ্যাঁ ?

বিড়িওলা বলল, বললাম, ঐ যে সেই শালা। শুনুন—আমরা লক্ষ করে দেখেছি আপনি শালা যতদিন এই রাস্তা দিয়ে শালা যান তক্ষুণি শালা বিদ্যুৎ নিবে যায়। কাল আপনি শালা এ পথে আসেননি কাল লোডশেডিংও হয়নি।

এবং বলতে না বলতে তার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। ঝুপ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। বিড়িওলা আমার হাত চেপে ধরে বলল, কী শালা, এবারে বিশ্বাস হল ?

আমি বললাম, এসব অতি বাজে কথা। এসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের বিক্রিয়া মাত্র।

বিড়িওলা তখন চিৎকার করে বলল, কি সব শালা বিক্রি-টিক্রীর কথা বলছেন শালা। ধরে শালা এমন প্যাঁদানি দেব যে বাপকা নাম ভুলে শালা অস্থির হবেন।

আমি বললাম, যত সব উজবুগের কথাবার্তা। আমি এ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সঙ্গে লোডশেডিং-এর কোনোই সম্পর্ক নেই। এই দেখুন—আমি ট্রাম লাইনে চলে যাচ্ছি—গেলেই বিদ্যুৎ এসে যাবে ?

এবারে বিড়িওলার সঙ্গে আরও কারা যেন জুটেছে। তাদের একজন বলল, আলবত বিদ্যুৎ আসবে আপনি একবার ট্রামলাইনে যান গলি ছাড়িয়ে—দেখতে পাবেন।

আমি বললাম, চলুন তা হলে—বলে বীরদর্পে হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম লাইনে গিয়েছি অমনি যেমন ঝুপ করে বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল তেমনি ঝুপ করে বিদ্যুৎ চলে এল। আমি একেবারে বোকা বনে গেলাম। বহু লোক বলতে লাগল—হ্যাঁ এরকম লোক আছে বটে। এক একজন এমন অপয়া লোক থাকে সে যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।

আমি বললাম, আমি ওসব মানি-টানি না। এটা হচ্ছে পাবলিকের চলাচলের রাস্তা, আমি যখন খুশি যতবার খুশি এই পথ দিয়ে যাব এবং আসব। আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না।

কিন্তু আমার বড় বড় কথা শেষ পর্যন্ত কি টিকল ?

পরদিন। হ্যাঁ আমার মনে পড়ছে, ঠিক তার পরদিন ঘটনাটি ঘটল। আমি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ আফজলকে পড়ানোর জন্য যেমনি ট্রামরাস্তা ছেড়ে গলির দিকে গিয়েছি অমনি হঠাৎ দেখতে পেলাম প্রায় পঁচিশজন লোক ধর ধর বলতে বলতে আমার দিকে ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে আলো-টালো সব নিবে একাকার হয়ে গেল। তারপর আর আমার মনে নেই। লোকগুলো আমাকে কোথায় মেরেছে তাও হাসপাতালে বসে সারা গা পরীক্ষা করেও বুঝতে পারলাম না। দুশো লোক প্রত্যেকে আমাকে সিকি ঘা করে দিলেও তা দাঁড়াতো পঞ্চাশ ঘা-য়ে। কিন্তু আমার দেহে একটুও আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

দেহে আঘাত থাকবার কথাও ছিল না। সেটা অবশ্য জানতে পেরেছিলাম পরে। কেউ আমাকে তাড়াও করেনি। যে জনা পঁচিশেক লোক আমার দিকে ধর ধর করে দৌড়েছিল তারা আমাকে ধরতে চেষ্টা করছিল না, বা আমাকে মারতেও চায়নি। তারা আমাকে হয়ত দেখেওনি। ঐ সময়ে একটা বাস ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, বাসটা ফাঁকা ছিল। ফাঁকা বাস দেখে একদল লোক নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরবার পথে ঐরকম ধর ধর করে উঠে বসবার জন্য দৌড়েছিল। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আমি ঐ দেখেই ধরে নিই লোকগুলি আমাকে ধরবার এবং মারবার জন্য ছুটছে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। এখন মনে হয় ছাত্র পড়াতে পড়াতে বা অন্য সময়ও (অন্য কতটুকু সময়ই বা থাকে ?) বেশ তো সব ভুলে গিয়েছিলাম। আবার সব মনে পড়ে গেল কেন। মনে না পড়লেই ভাল হত।

সদানন্দের প্রথম ও শেষ চিত্রসাংবাদিকতা

মিহির সেন

ঈশ্বর জন্মমুহূর্তেই বোধ হয় কিছু লোকের ভেতর প্রতিভার এক চিরস্থায়ী কুঁড়ি দিয়ে দেন। আমরণ যে কুঁড়ি ফুলের সম্ভাবনা নিয়ে বুকের ভেতর গুঁড়ি মেরে বসে থাকে; শত চর্চা, তোয়াজেও তাকে ফুটিয়ে ফুল করে তোলা যায় না।

সদানন্দ সিকদার ছিলেন এ রকম এক চিরসম্ভাবনাময় পুরুষ। পনেরো থেকেই তিনি উদীয়মান লেখক; পঞ্চাশেও তাই। অবশ্য এতে আদৌ ভগ্নোদ্যম নন তিনি, পূর্ণোদয়ের প্রত্যাশায় এখনও সাহিত্য আঁকড়ে পড়ে আছেন। দু-একবার যে ক্ষোভে অভিমানে সাহিত্য ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছে না হয়েছে না নয়, কিন্তু প্রতিবারই যেন ভেতর থেকে জীবনদেবতার নির্দেশ পেয়েছেন, সাহিত্যের এই দুর্দিনে কারো ওপর অহেতুক অভিমান করে অসহায় সাহিত্যকে ছেড়ে যেও না সদানন্দ!

তাই, সাহিত্যের এ-হেন দুর্দিনে তাকে ছেড়ে যাওয়াটা অকর্তব্য বিবেচনায়, অতি ক্ষুদ্র একটি অবলম্বন নিয়েও সাহিত্যকে আগলে পড়ে আছেন। একটি খ্যাত সিনেমা পত্রিকার প্রুফ দেখার দায়িত্ব নিয়ে থেকে গেছেন।

অবশ্য শুধু প্রুফ দেখাই নয়, মাঝে-মধ্যে পত্রিকার জন্য দু-চার কলম লেখারও গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর ঘাড়ে। ইংরেজি পত্রিকা থেকে মুক্তিমুখী ছবির কাহিনী বা তারকা-পরিচিতি ইত্যাদি ভেঙে-চুরে নতুন করে পরিবেশনের দায়িত্ব।

কিন্তু, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে সাধনার মূল্য যে একদিন না পাওয়া যায়ই—এই আপ্তবাক্য প্রমাণের জন্যই যেন একদিন সম্পাদক একদিন ডেকে পাঠালেন তাঁকে। নিজের নিভৃত কক্ষে আপ্যায়ন করে বসিয়ে আবেদন জানালেন, এ সংখ্যার জন্য একটা বড় লেখা লিখে দিতে পারবেন ?

আনন্দে সদানন্দের চোখ ফেটে জল আসছিল। সামলে নিয়ে বললেন, কি, উপন্যাস ? আমার সাড়ে বত্রিশটা উপন্যাস লেখা আছে স্যার। কোন্ সাবজেক্টের ওপর হলে ভাল হয় ?

সম্পাদক বাধা দিয়ে বললেন, আপাতত উপন্যাস থাক। এ সংখ্যার বোম্বের স্টুডিও রিপোর্টটা নিয়ে বড্ড আটকে গেছি। ওটা একটু ম্যানেজ করে দিতে পারবেন ?

সদানন্দ ঠিক ধরতে পারেন না। বোম্বের রিপোর্ট তো নিজস্ব সংবাদদাতা তপনকুমারই পাঠান। হাতে-গরম মুখরোচক সব রিপোর্ট। পাঠকদের কাছে যিনি চিত্র-তারকার মতই জনপ্রিয়।

সম্পাদক বোধহয় বুঝতে পারলেন। বললেন, তপনবাবু এই শেষ মুহূর্তে জানিয়েছেন যে, এ সংখ্যার লেখাটা পাঠাতে পারছেন না। কি

একটা ছবির কাজে নাকি বিশ্রীভাবে আটকে গেছেন। অথচ এত তাড়াতাড়ি বোম্বের আর কারো সঙ্গে যোগাযোগ করে ওঠাও সম্ভব নয়।

দায়িত্বের গুরুত্বটা উপলব্ধি করে সদানন্দ ভয়ে ভয়ে বললেন, তাহলে এ সংখ্যায় বাদই থাক না ওটা। ঘোষণা করে দিন যে, অনিবার্য কারণবশত—।

বাদ! – চমকে ওঠেন যেন সম্পাদক।—কী বলছেন মশায়? এত দিন সিনেমা পত্রিকার সঙ্গে জড়িত থেকেও এই জ্ঞানটুকু হল না যে, অম্যাবস্যা পূর্ণিমা একাদশী অশ্লেষা ছাড়া তবু পঞ্জিকার কথা চিন্তা করা যায়, কিন্তু বোম্বের সংবাদ ছাড়া সিনেমা পত্রিকার কথা—।

সদানন্দ তাঁর এই অনভিজ্ঞতায় লজ্জা পান। তবু সামান্য দ্বিধা নিয়ে বলেন, কিন্তু এখানে বসে বোম্বের কথা ঠিক ঠিক—

সম্পাদকের হো-হো হাসিতে থতমত খেয়ে থেমে যান সদানন্দ। হাসি সমাপ্ত হলে সম্পাদক স্নেহের সুরে বলেন, নাঃ, আপনাকে দিয়ে কস্যু হবে না মশায়। হোঁমরা-চোমরা সব বিখ্যাত পত্রিকায় শ্যাম-বাজারে বসে 'সায়গনের চিঠি' লিখছে, জীবনে যে কলকাতা ছেড়ে কোন্নগর যায়নি সে 'যখন কঙ্গোয় ছিলাম' লিখছে, আর আপনি একটা ফিল্ম-ম্যাগাজিনের সঙ্গে এতদিন যুক্ত থেকে সামান্য একটা বোম্বের সংবাদ লিখে দিতে পারবেন না?

সম্পাদকের ধিক্কারে উদ্বুদ্ধ হন সদানন্দ। উদ্দীপিত হন। তাই তো, সবাই পারলে আমিই বা পারব না কেন? জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার। হাতের কাছে এ রকম একটা সুবর্ণ সুযোগের সরোবর পেয়েছি যখন, নেমেই পড়ি না। জীবনের পরম সুযোগ কখন কোন্ দিক দিয়ে অলক্ষ্যে এসে হাজির হয়, কে জানে। এমনও তো হতে পারে, আজ ঘরে বসে বোম্বে দিয়ে যার শুরু, একদিন হয়তো

তাই দেখা দেবে সিওল, পিকিং, মস্কো, প্যারিসের নিজস্ব সংবাদদাতার চিঠি হয়ে। এমনি ঘরে বসেই। সাংবাদিকতার আসল প্রশ্ন কোথায় বসে লিখলাম নয়, কি লিখলাম তাই। তাছাড়া ঘটে যাহা তাই সত্য নহে; সাংবাদিকদের অনেক কিছু ঘটিয়েও নিতে হয়।

উদ্বুদ্ধ সদানন্দ এবার সাংবাদিকের গাম্ভীর্যে জিজ্ঞেস করেন, লেখাটা কবের ভেতর চাই?

সম্পাদক খুশির সুরে বলেন, কালকের ভেতরই। একমাত্র ওটার জন্যই পত্রিকা আটকে আছে।

সদানন্দ নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াতে সম্পাদক বললেন, লেখাটা কিন্তু তপনকুমারের নামেই যাবে। একটু সেইভাবে লিখবেন।

বিকেলে বাজার থেকে কেনা গোটা দশেক সিনেমা পত্রিকা, আর একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন সদানন্দ। তাক থেকে বাড়ির এতদিনের জমানো সিনেমা পত্রিকাগুলোও পেড়ে নিলেন। তারপর জামা-কাপড় ছেড়েই বসে গেলেন সেগুলো পড়তে।

পত্রিকার স্টুডিও-রিপোর্টগুলো গভীর মনোযোগসহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে কতকগুলো সাধারণ সত্য আবিষ্কার করলেন সদানন্দ। এক: চিত্রতারকারা চিত্র-সাংবাদিকদের যেমন ভয় ও সমীহ করেন তেমনি ভক্তিও করেন। অভিনেত্রীরা তো রীতিমত 'প্যার' করেন তাঁদের। দুদিন না দেখলেই দিলমে দুখ্ পান। বিরহিণীর মত আকুল প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকেন তাদের জন্য। দুই: চিত্রজগতের সর্বত্র অবাধ গতি। এমন কি অভিনেত্রীদের কক্ষও। তিন: চিত্রতারকারা তাঁদের মনের যত গোপন কথা ও ব্যথা একমাত্র চিত্রসাংবাদিকদের কাছেই খোলসা করে ব্যক্ত করে থাকেন। বোধহয় চিত্রজগতে একমাত্র তাঁদেরই পরম সংবেদনশীল সাহিত্যিক ও দার্শনিক বলে বিশ্বাস করেন বলেই।

চিত্র-সাংবাদিকতার গোপন চাবি-কাঠিটা এত অনায়াসে আয়ত্ত করায় মনে মনে উৎফুল্ল হন সদানন্দ। এখন দ্বিতীয় কাজটি বাকী। তপনকুমার-ভাবে ভাবিত হয়ে নেওয়া। বৈষ্ণব পুরুষ কবিরা যেভাবে রাধা-ভাবে ভাবিত হয়ে নিতেন।

প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলে সদানন্দ কলম তুলে নিলেন। একবার কপালে ঠেকিয়ে নিলেন কলমটা। তারপর শুরু করলেন জীবনের প্রথম চিত্র-সাংবাদিকতা—কামিনীকুমারীর সঙ্গে এক দোলনায় দুলতে দুলতে লিখছি।

সব রচনারই আরম্ভটাই পরীক্ষা। তারপর, একবার শুরু হয়ে গেলে, বাগ্‌দেবী নিজেই এসে সাধকের হাত ধরে সটান সমাপ্তিতে পৌঁছে দেন। সব জাত-লেখকেরই এটাই নাকি অভিজ্ঞতা। সদানন্দর নিজের অভিজ্ঞতাও তাই।

সমস্ত হৃদয় ঢেলে রচনাটি যখন শেষ করলেন, সদানন্দ নিজেই তখন বিমোহিত। তপনকুমারের চেয়ে কোন অংশে খারাপ হয়নি, নিজেই বুঝলেন সেটা। বরং কোন কোন অংশ আবেগ ও বৈচিত্র্যে অনেক বেশী চমকপ্রদ হয়েছে।

পরদিন সকালেই লেখাটা নিয়ে পত্রিকা অফিসে হাজির হলেন। সম্পাদক শালীর বিয়েতে আটকে গিয়েছিলেন। সহ-সম্পাদক ভদ্রলোকের গোটা লেখাটা পড়ার সময় বা ধৈর্য না থাকায় শুধু পৃষ্ঠা সংখ্যাটা দেখে নিয়ে প্রেসে পাঠিয়ে দিলেন লেখাটা।

বোম্বের চিঠি ছাড়া পত্রিকার সব কিছুই তৈরি ছিল, দুদিনের মাথায়ই তাই পত্রিকা বাজারে বেরিয়ে গেল। সদানন্দ সব সংখ্যাই একটি করে বিনে পয়সায় পান। এবার স্টল থেকে আরো চার কপি কিনে ফেললেন। তিন বিবাহিতা শালীর জন্য তিনটি আর

একটা আচমকা কোন প্রয়োজনের কথা ভেবে।

উপহার সংখ্যাগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দেবার জন্য পর পর দু'দিন অফিস কামাই করলেন সদানন্দ। তৃতীয় দিন অফিসে আসার পথে আর একটা কপি কিনতে গিয়ে চক্ষুস্থির। বাজারে আর একটি কপিও নাকি নেই। সব শেষ। তবু কাগজের হকাররা, ক্রেতারা এসে স্টলে হামলা করছে পত্রিকার জন্য।

অনুসন্ধানে জানলেন, এ সংখ্যায় বোম্বের একটা কি লেখার জন্যই নাকি এই অবিশ্বাস্য আলোড়ন।

সদানন্দ আন্দাজেই বুঝলেন, কোন্ লেখাটার জন্য। মনে মনে একবার সকৃতজ্ঞ চিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন, এতদিনে তাহলে চোখ তুলে চাইলে দেবতা।

অফিসের সামনে এসে দেখেন, বিরাট ভীড়। অনেকের হাতেই এ সংখ্যা পত্রিকাটি। উত্তেজিতভাবে কী যেন সব আলোচনা করছে। কারো কারো স্বরে কৌতুক। সম্পাদকের ঘরেও কিছু লোক।

টুকরো কিছু শব্দ থেকে অনুমান করতে পারেন সদানন্দ, সবার আলোচ্যই এ সংখ্যার বোম্বের চিঠি। গর্বে উত্তেজনায় প্রায় বেসামাল সদানন্দ একবার চিৎকার করে জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, ঐ রচনাটি আমার—আমার। আসলে তপনকুমারের নয়। কিন্তু অনেক কষ্টে সংযত করেন নিজেকে। কারণ, সাংবাদিকদের উত্তেজিত হতে নেই। ঈশ্বরের মতই নিরাসক্ত, নির্মোহ, সর্বংসহ হতে হয় তাঁদের। নাম-হীনতার আড়ালে থেকেই জীবনের কঠোরতম কর্তব্যটুকু পালন করে যেতে হয়।

খুশিতে ডগমগ কিন্তু আপাত নিরাসক্তি নিয়ে সম্পাদকের ঘরে ঢোকেন সদানন্দ। সম্পাদক তাঁকে দেখেই উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে

ফিয়ে ওঠেন, বলি ইয়ার্কি পেয়েছেন মশায়? যদি নাই পারবেন
হলে রাজী হয়েছিলেন কেন? আমার এই সর্বনাশটা কি—, বলেই
য়াল হয় বোধহয়, অফিসিয়ালি সদানন্দ তপনকুমার নন। এবং ঘরে
খনও পাঠকরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

সম্পাদক পাঠকদের কাছে হাত জোড় করে অনুরোধ জানালেন,
াপারটা কি করে হল আমরা ঠিক অনুমান করতে পারছি না এখনও।
বু এজন্য ক্ষমা চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করছি আমরা।
াপনারা এবার দয়া করে—।

বাইরের লোকরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সদানন্দ ভয়ে ভয়ে
জ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে স্যার?

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে যেন। সম্পাদক বাগে ফেটে পড়েন, কি
য়েছে? বলতে লজ্জা লাগছে না? দেখুন কি হয়েছে।

সামনে থেকে একটি পত্রিকা নিয়ে, পেজ-মার্ক দেওয়া পাতাটা খুলে,
দানন্দর দিকে ছুঁড়ে দেন প্রায়। সদানন্দ তাকিয়ে দেখেন প্রায় পুরো
লখাটাই লাল পেন্সিলে আণ্ডারলাইন করা।

প্রথম লাইনটাই লাল চিহ্নিত দেখে মনে মনে একবাব পড়ে নেন
দানন্দ—'কামিনী-কুমারীর সঙ্গে এক দোলনায় দুলতে দুলতে
লখছি।' কিন্তু কোন ভুল চোখে না পড়ায় দ্বিধান্বিত স্বরে বলেন,
সকলেই তো এভাবেই লেখে। শুরুটায় চমক না থাকলে—।

সম্পাদক গম্ভীর মুখে বললেন, শুধু চমক থাকলে আপত্তি ছিল না,
কিন্তু এতে রীতিমত ভূমিকম্পের ধাক্কা। যার সঙ্গে দোলনায় দুলতে
দুলতে লিখেছেন, তিনি যে গত ছ' মাস ধরে জীবনমৃত্যুর দোলনায়
দুলছেন, তাও আবার লণ্ডনে, এ সংবাদটুকু জানতেন না?

সদানন্দ অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু এ সপ্তাহের একটা ইংরেজী

পত্রিকায় যে একটা ছবির নিচে লেখা আছে দেখলাম—ক্ল্যাপ দিচ্ছেন কামিনী।

সম্পাদক বললেন, সে অন্য কামিনী, কামিনী সাহানী, আপনি। কামিনীর সঙ্গে দোলনায় দুলেছেন তিনি নন।

কাগজে নামের সঙ্গে পুরো উপাধি উল্লেখ না করায় এই বি অভ্যেসের জন্য সাংবাদিকের ওপর মনে মনে দারুন চটে যান সদানন ওঁকে জব্দ করার জন্যই যেন এ সব ষড়যন্ত্র !

সদানন্দ পরবর্তী লাল-লাঞ্ছিত অংশে চোখ নামান—'কামি কুমারীর বাড়ি থেকে বেরুতে দেরী হয়ে গেল। কিছুতেই আমা ছাড়তে চায় না কামিনী। অনেক কষ্টে বেরিয়ে এসে দেখি কোন দি ট্যাক্সির ট-ও দেখা যাচ্ছে না। অথচ আধ ঘণ্টার ভেতর স্টুডিও পৌঁছাতেই হবে। না হলে খেয়ে ফেলবে কাঞ্চনকুমার। ভারতব শ্রেষ্ঠ নায়ক, গোটা দেশের যুব-সমাজের 'গুরু'—মেজাজই আলাদ তার ওপর আমার সঙ্গে কা একটা গোপন কথা আছে বলে আ স্টুডিওতে লাঞ্চের নেমতন্ন করেছে।

দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে অগত্যা সামনে যে ট্রামটা পেলাম, সেটাতে উঠে পড়লাম। ট্রামের কণ্ডাক্টার আমাকে দেখে বিস্ময়ে থ'—আ সাব ট্রাম 'পর যা রহা হ্যায় !

চিত্র-সাংবাদিকদের এই এক মুস্কিল। দুনিয়াভর সবাই চেনে তাঁদে নিশ্চিন্ত মনে একটু সহজ ভাবে চলাফেরার উপায় নেই। হে বললাম, ম্যায় তো কাঞ্চনকুমার নেহি হ্যায়, ইস্পালা কাঁহাসে মিলেগা

কণ্ডাকটার আমার বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল, ক্যা বোলতা সাব একঠো কোন ফিক্‌নেসে কাঞ্চনকুমারকো বাপ আপকো ইস্পালা জেজে এ কোই নাই জানতা ?

তা অবশ্য ঠিক। এতক্ষণে খেয়াল হল, কামিনীর ওখান থেকে
টা ফোন করে দিলেই তো পারতাম।
সদানন্দ একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, হিন্দীটার কথা বলছেন
? কাউকে দেখিয়ে নেবার মত সময়ই পেলাম না। অবশ্য চরিত্র-
াকেই অবাঙালী ধরে নিলে এই ভাঙা ভাঙা হিন্দী সংলাপে একটা
াদা জোনাল-এফেক্ট মানে রিয়ালিটি—।
সম্পাদক খিঁচিয়ে ওঠেন, নিকুচি করেছে রিয়ালিটির। ভাষার
কে বলছে মশায়? বোম্বেতে যে ট্রাম নেই সেই জ্ঞান-গম্যিটুকুও
আপনার?
সদানন্দ আকাশ থেকে পড়েন। অত বড় একটা শহর অমন
শহর, অথচ একটা সাধারণ ট্রাম পর্যন্ত নেই সেই শহরে!
সম্পাদক বিকৃত স্বরে তাগাদা মারেন, এখানেই থেমে গেলেন
? এ তো সবে শুরু। এগোন এগোন।
পরবর্তী লাল-লাইনে নেমে আসেন সদানন্দ। কিন্তু বারকয়েক
ও এ-অংশে কোন ভুল চোখে পড়ে না। সম্পাদক আবার তাড়া
জোরেই পড়ুন না—
সদানন্দ ভয়ে ভয়ে পড়তে শুরু করেন, 'আমি যখন ঘরে ঢুকলাম
া ঠাকুর তখন পাশের ঘরে শাড়ি পাল্টাচ্ছিলেন। এ-ঘরে বসেই
নায় তার খণ্ড-চিত্র দেখছিলাম। আমার অস্বস্তি লাগছিল।
উত্তেজনাও যে বোধ করছিলাম না, তা নয়। প্রসাধন শেষে
া যখন এ-ঘরে এল, যেন সদ্য প্রস্ফুটিত একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।
ন দামী সাদা শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। কানে সাদা হীরের দুল।
্য যে-কোন পুরুষের বুক কাঁপিয়ে দেবার পক্ষে শ্রীমতীর সাদা
া-দাঁতের ঝিলিক-হাসিটুকুই যথেষ্ট। হেসে নমস্কার করে আমার

গা ঘেঁষে বসে অভিমানে কচি খুকু হয়ে বলল, দো রোজ বাদ অ
আনেকো ফুরসুৎ হুয়া !

আমি হেসে বললাম—'

সম্পাদক হাত তুলে থামিয়ে দিলেন, থাক, থাক, আপনার
কষ্ট করে হাসার দরকার নেই। যা হাসার তা পাঠকরাই হাসছে।

সদানন্দ মিনমিন করে বললেন, কিন্তু এতে ভুলটা কোথায়।
বুঝছি না তো ? এ তো সাধারণ একটা ডেসক্রিপসন।

সম্পাদক দাঁতে দাঁত চেপে বললেন. কিন্তু যাঁর ডেসক্রিপসন
শ্রীমতী শাম্মির কোন ছবি জীবনে দেখেননি কোনদিন ?

সদানন্দ দ্রুত একবার স্মৃতির অ্যালবাম হাতড়ে নেন। কিন্তু স
মুখটা কিছুতেই মনে পড়ে না। তাছাড়া, হিন্দী সিনেমা একেবা
দেখেন না বলে কোন বোম্বে তারকার মুখই ওঁর কাছে ঔজ্জ্বল্যে
তারা নয়। কিন্তু নায়িকার আন্দাজে যে বিবরণ দিয়েছেন, তার স
মিল না থাকলে কোন মেয়েরই তো নায়িকা হবার প্রশ্নই ওঠে না।

সম্পাদক নিঃশব্দে পত্রিকাটা টেনে নিয়ে কয়েক পাতা উল্টে এ
ছবি বের করে সদানন্দর সামনে ধরেন। একটি কঠোর পুরুষ-মু
ক্লোজ-আপ। নিচে চিত্র-পরিচিতি—সদ্য রোগমুক্তির পর না
শাম্মি ঠাকুর।

শাম্মি ঠাকুর। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হয় না সদানন্দ
অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, কিন্তু এ তো পুরুষ দেখছি!

সম্পাদক বিদ্রুপের সুরে বললেন, আপনার মত কৃতী সাংবাদি
এক কলমের খোঁচায় পুরুষ নারী হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ক্যামেরার
আর সে-সুযোগ নেই। তা, আপনারই বা ওকে রূপসী মহিলা ভা
মত কি এমন ঘটেছিল ?

হেতুটা যে শ্রীমতী নিম্মি কাপুরের বিশ্বাসঘাতকতা তা আর মুখ ফুটে বলতে পারলেন না সদানন্দ। কোন একটা কাগজে যেন শ্রীমতী নিম্মির হুবহু এই বিবরণই পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিম্মি মেয়ে হলেও শাম্মি যে পুরুষ হতে পারে, এ-সম্ভাবনার কথা একবারও মাথায় আসেনি। মিনমিন করে বললেন তবু, নামটার জন্যই একটু গোলমাল হয়ে গেছে বোধহয়।

সম্পাদক একটা টেলিগ্রাম এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, সে তো আমরাও বুঝছি। কিন্তু এর খেসারতটা কে দেবে?

টেলিগ্রামটা ওপর একবার চোখ বুলিয়েই আতঙ্কে বুক শুকিয়ে যায় সদানন্দর। শাম্মিব এক লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করেছে।

টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত টেলিগ্রাম আর চিঠিগুলোর ওপর একবার সভয়ে চোখ বুলিয়ে সদানন্দ নিষ্প্রাণ স্বরে জিজ্ঞেস করেন, ও সবগুলোই কি ক্ষতিপূরণের চিঠি?

সম্পাদক বিকৃত স্বরে বললেন, না হলে কি অভিনন্দন পত্র। নিজের অমূল্য অবদানের ওপর আর একটু চোখ বোলান। থামলেন কেন?

সদানন্দ আবার স্ব-রচনায় দৃষ্টি নামান। পরবর্তী লালাঙ্কিত অংশে দৃষ্টিপাত করেন—সম্প্রতি ইয়াসিন আর নবাগতা নায়িকা মুদ্রিত অক্ষরগুলো এবার সদানন্দর চোখের সামনে সরষে ফুলে রূপান্তরিত হতে শুরু করে।

সম্পাদক নিঃশব্দে আর একটি মোটা থাম এগিয়ে দেন সদানন্দের দিকে।

—নিন পড়ুন। সত্যি সাংবাদিকের কী হাল করে ছেড়েছেন দেখুন।

সদানন্দ খামের পেট থেকে সন্তর্পণে একটি চিঠি বের করেন। তপনকুমারের চিঠি। দীর্ঘ চিঠির প্রতি ছত্রে ক্ষোভ, ক্রোধ, অভিমান বিস্ময় ফেটে পড়ছে। ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন তপনকুমার, পত্রিকার জন্মাবধি আপনাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক সম্পর্কের প্রতিদান যে আপনারা এভাবে দেবেন, কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। স্বীকাব করছি, আপনাদের পত্রিকার জন্যই আজ আমায় এই খ্যাতি। কিন্তু পত্রিকার বর্তমান জনপ্রিয়তার পিছে আমারও কি কোন অবদান নেই? আমি একটি ছবির কাজে ব্যস্ত আছি, এ সত্যি অজুহাত বিশ্বাস না করে আপনারও শেষপর্যন্ত সেই গুজবেবই শিকার হলেন যে, আমি অন্য পত্রিকায় চলে যাবার চেষ্টা কবছি? আর, সেজন্যই কি আমার চরিত্র-হননের জন্য এই জঘন্য ষড়যন্ত্র? আপনাদের এই রচনার (বাহ্যত আমার রচনা) কী অবিশ্বাস্য প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তা এখানে না এলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। গত কয়েকদিন ধবেই আমি এক অজ্ঞাত-স্থানে লুকিয়ে আছি। বাড়ীতে মুহুর্মুহু লোক আসছে আমার অনু-সন্ধানে। ক্রমাগত ফোন আসছে। শুনছি গুণ্ডারাও নাকি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে হত্যা করার জন্য।

আর, গুণ্ডাদেরই বা দোষ কি? আমি হলেও এক্ষেত্রে লেখকেব বিরুদ্ধে গুণ্ডাই লাগাতাম। আপনাদের কৃতী, গুণধর (অন্তরালবর্তী) লেখক বীনাকুমারী প্রসঙ্গে লিখেছেন—বীণাকুমারী তাঁর গোপন দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আমার কোলে মুখ রেখে সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না তার। বিশ্বাস করে যাঁর হাতে নিজের সমস্ত 'জীবন যৌবন ধনমান' নিঃশেষে সঁপে দিয়েছিল, সে নাকি একটা জঘন্য জানোয়ার। অন্য একটা একসট্রা মেয়েকে নিয়ে গোপনে লদগা-লদগি করছে এখন।

বীণাকুমারী যে আমাকে এতটা বিশ্বাস করে, আপন ভাবে, জানতাম না এতদিন। এ যেন পঁচিশ লাখের নায়িকা বীণাকুমারী নয়, কোন অপাপবিদ্ধা গ্রাম্য কিশোরী বীণা!

কিন্তু আমিই বা ওকে এই ব্যক্তিগত হৃদয়ঘটিত সংকটে কী পরামর্শ দেব? আমি নিঃশব্দে ওর শুধু ব্রেসিয়ার-পরা উন্মুক্ত পিঠে সান্ত্বনায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।'

অথচ বোম্বের সকলেই জানেন এবং আপনাদেরও অজানা নয় যে, যে-বীণাকুমারীকে আপনারা আমার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আমার এক বছরের ওপর মুখ দেখাদেখি বন্ধ। একটি চিত্রঘটিত মামলায় তাঁর বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলাম বলে। আপনাদের প্রকাশিত সংবাদ পাঠে ক্রুদ্ধ সঞ্জয়কুমার, দীর্ঘ প্রেমের পর্ব পেরিয়ে যাঁর সঙ্গে সম্প্রতি বীণাকুমারীর বিয়ের কথাবার্তা পাকা, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছেন। এবং সংবাদপত্রের সাংবাদিক-দের ডেকে বীণার সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

স্বভাবতই বীণাকুমারী পুরো ঘটনাটা তাঁর বিরুদ্ধে আমার এক প্রতিশোধমূলক ষড়যন্ত্র বলে বিশ্বাস করেছেন। এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলাম, আমার জ্যান্ত বা মৃত মুণ্ডুর জন্য দশ লক্ষ টাকা গুণ্ডাদের অফার করেছেন।

শুধু এই-ই নয়, আপনাদের যশস্বী সাংবাদিকের (অন্তরালবর্তী) দৌলতে আমি এমন স্টুডিওতে মহরৎ উৎসব আলোকিত করে উপস্থিত ছিলাম, যা এক বছর আগে উঠে গেছে। এবং বর্তমানে একটি পাগলা গারদে রূপান্তরিত। তাঁর এক কলমের খোঁচায় মৃত পরিচালক হলিউড থেকে ছবির অফার পেয়েছেন। বোনের বিয়ে উপলক্ষে আসা

পাকিস্তানের অভিনেত্রী এখানে দশটি ছবির ব্যস্ত নায়িকা হয়ে গেছেন (যার ফলে পাকিস্তানের দশটি ছবি থেকে ইতিমধ্যেই তার নাম কাটা গেছে)। তাঁর কৃপায় তিনটি সুখের সংসার ভেঙেছে। দশটি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা উঠেছে আদালতে। পাঁচটি স্থিরীকৃত বিয়ে ভেঙে গেছে। অজ্ঞাতবাসে থাকার জন্য রচনাটির অন্যান্য সুদূরপ্রসারী ফলাফল অবগত হবার এখনও সময় পাইনি। কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে আমার কেরিয়ার শেষ হবার পক্ষে এগুলোই কি যথেষ্ট নয় ?

চিঠিটা শেষ করে বিমূঢ় সদানন্দ কিছুক্ষণ স্থাণুর মত বসে থাকেন। চিত্র-জগৎ এতদিন তাঁর চোখে ছিল এক স্বপ্নের রূপকথার রাজ্য। কিন্তু এখন তা এক দুঃস্বপ্নের প্রেতপুরী বলে মনে হতে লাগল। তবু অনেক কষ্টে মিনমিন করে জিজ্ঞেস করলেন একবার, তাহলে সামনের সংখ্যায় ভ্রম স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়াই ভাল বোধহয়।

সম্পাদক দাঁত বের করে খেঁকিয়ে উঠলেন, ভ্রম ভ্রম কি করছেন মশায় ? এতো রীতিমত বিভ্রম। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার রচনা আর, আপনার কৃপায় ব্যাপারটা কি শুধু ক্ষমাপ্রার্থনার স্তরে আছে নাকি ? এখন সর্বসমক্ষে শুধু নাকে খৎ-টাই বাকি।

শুধু নাকে খৎ-এর ওপর দিয়ে এ-যাত্রায় কোনক্রমে পার পেলে তা চোদ্দপুরুষের ভাগ্য — মনে মনে ভাবলেন সদানন্দ।

সম্পাদক বেয়ারাকে ডেকে পত্রিকার নিজস্ব ফটোগ্রাফারকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। তারপর সদানন্দর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, শুনুন, সামনের সংখ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলে পত্রিকা ডকে উঠে যাবে। তাই আমরা ঠিক করেছি, দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমরা ত্রুটি স্বীকার করব। এবং সেই বিজ্ঞাপনে অকপটে সব স্বীকার করব আমরা। মায় আপনার কীর্তিকলাপ পর্যন্ত। এবং আপনার ছবিসহ।

ফটোগ্রাফারকে ঘরে ঢুকতে দেখে সম্পাদক আঙুল দিয়ে ঘরের একটা দিক দেখিয়ে দিলেন, সদানন্দবাবু, আপনি ঐ কোণে গিয়ে দাঁড়ান। আপনার ফটোটা তুলে ফেলুক।

বলির পাঁঠার মত পাশে পায়ে নির্দিষ্ট কোণে গিয়ে দাঁড়ান সদানন্দ। কিন্তু ফটোগ্রাফারকে ক্যামেরা তুলতে দেখে মুহূর্তে যেন ভেতর থেকে জীবন-দেবতার এক অমোঘ দৈববাণী শুনতে পান তিনি—সদানন্দ, শুধু চিত্র-সাংবাদিকতা নয়, কোন চলচ্চিত্র পত্রিকার 'নিজস্ব ফটো-গ্রাফারের ক্যামেরার চোখের' সামনেও এই তোমার প্রথম ও শেষ উপস্থিতি। এই মাহেন্দ্রক্ষণ হেলায় হারিও না!

এত দুঃখের ভেতরও ক্যামেরার সাটার 'ক্লিক' করার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে তাই একবার ফিক করে হেসে ফেলেন সদানন্দ।

পঞ্চতন্ত্র

ইন্দ্রমিত্র

তোড়জোড় আরম্ভ হয়েছে। কমণ্ডলু ঘষামাজা চলছে, আলমারি থেকে নামাবলী বেরিয়েছে, ব্যাঙ্কের লকার থেকে জপমালা পর্যন্ত বাড়িতে চলে এসেছে। কিন্তু মুখে কোনও কথা নেই।

দ্যাখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। মিসেস মুখার্জি সব নজর করে যাচ্ছেন, কিন্তু চুপচাপ। মুখে কিছু না বললেও মিসেস মুখার্জি এবার মনস্থির করে ফেলেছেন। একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না। পুরুষ মানুষের চরিত্রের উপর আস্থা রাখা অসম্ভব, শেষ পর্যন্ত সন্নিসী-টন্নিসী হয়ে গেলে তা খুব বিপদের কথা।

আরও দিনকয়েক চুপচাপ কাটল। তারপর একদিন মুখার্জি সাহেব বললেন—সামনের সোমবার রওনা হচ্ছি। তে-রাত্তির বাদে ফিরে আসব।

মিসেস মুখার্জি শান্ত গলায় বললেন, গত চারবছরও প্রত্যেকবার তে-রাত্তির বাইরে কাটিয়ে এসেছ আমি কিছু বলিনি। কিন্তু এবার আমিও সঙ্গে যাব।

মুখার্জি সাহেব হাসতে লাগলেন। অঢেল হাসি, হাসি আর কিছুতেই ফুরোয় না। বহু কষ্টে হাসি কমিয়ে বললেন—সঙ্গে যাবে মিনি বেড়াল, কোমর বেঁধেছে। মাইণ্ড, মিনি বলেছি, ম্যাকসি বলিনি।

—যাই বলো, আমি এবার নির্ঘাত সঙ্গে যাব।

হাসি মুখে মুখার্জি সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালেন মিসেস মুখার্জির চেয়ারের পিছনে। মিসেস মুখার্জির মাথায় ডানহাতখানা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে রেখে গাঢ় গলায় বললেন—তা হয় না সতী লক্ষ্মী, তা হয় না।

মিসেস মুখার্জি এমনভাবে নড়ে বসলেন যে আশীর্বাদের হাতখানা মাথা থেকে পুরোপুরি সরে গেল। মিসেস মুখার্জি অভিমান করে বললেন—কেন হবে না? তুমি কোথায় গিয়ে তে রাত্তির অষ্টপ্রহর নামকীর্তন করবে আর আমি ঘরে বসে আমোদ আহ্লাদ করব? কেন, আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি? আমি সঙ্গে থাকলে কি তোমার সাধনভজন মাটি হয়ে যাবে? আমি কি এতই পাপিষ্ঠা?

আবার এসে নিজের চেয়ারে বসলেন মিস্টার মুখার্জি। অভয় দিয়ে বললেন—ছিঃ, তুমি কোন্ দুঃখে পাপিষ্ঠা হতে যাবে? পাপিষ্ঠা নও বলেই তো সাধনভজনে তোমার কোনও দরকার নেই। কিন্তু আমি পাপী, ঘোরতর পাপী, এখনও অজস্র পাপ করি, সাধনভজন করলেও হয়তো নিস্তার পাব না, অন্তত যদি খানিকটা রেহাই পাই। তুমি কোন্ দুঃখে কষ্ট করতে যাবে?

মিসেস মুখার্জি ঘাড় নেড়ে বললেন—কিন্তু এবার আমি যাবই। কিছুতেই তোমাকে একলা ছেড়ে দেব না।

মুখার্জি সাহেব বললেন, একলা? একলা কোথায়? কোনোবারই

একলা যাইনি, এবারেও আমার একলা যাওয়ার কথা আসছে না। আগে যাদের সঙ্গে গিয়েছি, এবারেও তাদের সঙ্গে যাব।

—সেই পরেশ ঘোষাল, অনাদি চৌধুরী, সলিল গুপ্ত আর মাধব গোস্বামী?

—সেই পরেশ, অনাদি, সলিল, মাধব আর এই হতভাগ্য।—দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখার্জি সাহেব বললেন—ওদের সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই হয় না, ওরা অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, কপালগুণে ওদের দলে আমার জায়গা হয়েছে, না হলে আমার সাধ্য কী যে বছরে অন্তত তিন দিন ওদের সঙ্গে সমানে জপতপের সুযোগ পাই।

মিসেস মুখার্জি কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, বলা আর হল না, হুড়মুড় করে পরেশ ঘোষাল ঢুকে পড়লেন। ধপ করে চেয়ারে বসলেন। কাতর গলায় বললেন—মিসেস মুখার্জি, আপনি আমাকে বাঁচান। ডুবে যাব, মরে যাব, সর্বস্বান্ত হয়ে যাব।

মিসেস মুখার্জি খুব দুঃখ পেলেন। আহা, চোখের সামনে একজন মানুষ ডুবে যাবে, মরে যাবে, সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কেন? হয়েছে কী?

মিসেস মুখার্জি শান্ত গলায় বললেন—কী হয়েছে?

—সর্বনাশ হয়েছে।—পরেশ ঘোষাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—অসীমার মাথা বিগড়ে গেছে।

—অসীমা? মানে আপনার বউ অসীমা?

ঘাড় নেড়ে পরেশ ঘোষাল বললেন—নিজের বউ ছাড়া আর কারও বউয়ের মাথা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। নিজের মাথা খারাপ হলেও বোধ করি আমি এমন পাগল হতাম না। বাঁচান, মিসেস মুখার্জি, আমাকে বাঁচান।

মিসেস মুখার্জি হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন পরেশ ঘোষালের মুখের দিকে। বউয়ের মাথা বিগড়ে গেলে স্বামীর জীবনে আর রইল কী !

মিসেস মুখার্জি বললেন—কণ্ডিশন কি খুব সীরিয়াস? আগে আপনি কিছু বুঝতে পারেননি, হঠাৎ উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে?

—হঠাৎ, একবারে হঠাৎ—দু'চোখ বড় করে পরেশ ঘোষাল বললেন—কণ্ডিশন যে এতদূর সীরিয়াস হয়ে গেছে, আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা কবতে পারিনি। •অসীমাব মুখে প্রলাপ শুনে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।

সকলেই জানে, অসীমাব স্বভাবটি খুব শান্তশিষ্ট। অসীমার মুখে প্রলাপ শোনা গেলে আইন বজায় থাকে না। কিন্তু ভগবানের মার আইনের বার।

মিসেস মুখার্জির বুক মায়ায় ভরে গেল। এই দুঃসময়ে কি পরেশ ঘোষালকে চা অফার করা ঠিক হবে? না, থাক।

পরেশ ঘোষাল বিমর্ষ মুখে বললেন—অসীমা কী বলছে জানেন? না শুনলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

মিসেস মুখার্জির বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। এখনই একটা অবিশ্বাস্য প্রলাপবাক্য শুনতে হবে।

শুনতে হল। পরেশ ঘোষাল হতাশ গলায় বললেন—অসীমা বলছে, নিজ মুখে বলছে. স্পষ্ট করে বলছে, 'গত চারবছরেও প্রত্যেকবার তে-রাত্তির বাইরে কাটিয়ে এসেছ। আমি কিছু বলিনি। কিন্তু এবার আমিও সঙ্গে যাব।

মুখার্জি সাহেব চমকে উঠে বললেন—বলেন কী মিস্টার ঘোষাল? আমার মনে হয় আপনি ভুল শুনেছেন। মিসেস ঘোষালের মতো

ভদ্রমহিলার মুখ থেকে এমন অসম্ভব কথা কিছুতেই বেরোতে পারে না। কিছুতেই না, কিছুতেই না।

মিসেস মুখার্জি চুপ করে রইলেন।

কিন্তু অস্থির হয়ে ঘরময় পায়চারি আরম্ভ করে দিলেন মুখার্জি সাহেব। খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে বাঙলা কবিতা আওড়ালেন। স্বস্তি হল না। গড়গড় করে কয়েক স্ট্যাঞ্জা ইংরেজী কবিতা ঝাড়লেন। বুকে যেন কিছু বল পাওয়া গেল। যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন—'গত চার বছরও প্রত্যেকবার তে-রাত্তির বাইরে কাটিয়ে এসেছ। আমি কিছু বলিনি। কিন্তু এবার আমিও সঙ্গে যাব।' কী অসম্ভব কথা! কমণ্ডলু, নামাবলী আর জপমালার সঙ্গে ওয়াইফ? অ্যাবসার্ড।

নিজের চেয়ারে এসে বসলেন মুখার্জি সাহেব।

পরেশ ঘোষাল একটু লজ্জিত হয়ে বললেন—মিস্টার মুখার্জি আপনি বড্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। শান্ত হোন। শান্তভাবে সব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

মিসেস মুখার্জি ঢোক গিলে বললেন—তাহলে কি আমারও মাথা বিগড়ে গেছে?

মুখার্জি সাহেব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তা নিয়ে দুঃখ কোরো না। কখনো-কখনো সব ভদ্রমহিলারই মাথা বিগড়ে যায়। সব ভদ্রমহিলার জীবনেই দুঃসময় আসে। সময়ে আবার সব ঠিক হয়ে যায়।

টেলিফোন। সারাক্ষণ বিকল হয়ে থাকেন, এখন উনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। শালা।

নিতান্ত অনিচ্ছায় হাত বাড়িয়ে মুখার্জি সাহেব রিসিভার তুলে নিলেন—হ্যালো। হ্যাঁ। কথা বলছি। 'ডাক্তার নিয়ে যেতে হবে? আপনার বাড়িতে? এক্ষুনি?

পরেশ ঘোষাল চমকে উঠে বললেন—আমার ব্যাড়ি থেকে টেলিফোন
। নাকি ?

টেলিফোনের মুখে হাতচাপা দিয়ে মুখার্জি সাহেব বললেন—না
াাদি চৌধুরী কথা বলছেন।

হাত সরিয়ে নিয়ে মুখার্জি সাহেব বললেন—না না, আপনি বলে
ন, আপনার কথা আমি মন দিয়ে শুনে যাচ্ছি। কিছু ঘাবড়াবেন
। কলকাতায় ভালো ডাক্তারের ছড়াছড়ি। আপনি দয়া করে
েলিফোনটা ছেড়ে দিন, আমি ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। অনেক
থা বলার আছে? বেশ, বলুন। আমি শুনছি। আপনি বলে
ন, আমি একটিও শব্দ না করে শুনে যাচ্ছি, পুরোপুরি আধঘণ্টা শুনব,
াধঘণ্টার পর একটি সেকেণ্ডও শুনব না, ঘড়ি ধরে শুনছি। বলে যান।

বলে রিসিভারটা চেয়ারের উপর শুইয়ে রেখে মুখার্জি সাহেব
িগারেট ধরালেন। অনাদি চৌধুরী যা খুশি বলে যেতে থাকুন।
াধঘণ্টা বাদে রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিলেই হবে।

গলা খাটো করে চোখ বুজে মুখার্জি সাহেব বললেন—গত চার
ছরও প্রত্যেকবার তে-রাত্তিরে বাইরে কাটিয়ে এসেছ। আমি কিছু
লিনি। কিন্তু এবার আমিও সঙ্গে যাব।

মুখার্জি সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন।
াধঘণ্টা হতে এখনও ঢের দেরি আছে।

মিসেস মুখার্জি আচ্ছন্নের মত বললেন—গত চারবছরেও প্রত্যেকবার
ত-রাত্তির বাইরে কাটিয়ে এসেছ। আমি কিছু বলিনি। কিন্তু এবার
আমিও সঙ্গে যাব।

মুখার্জি সাহেব বললেন—হুঁ। অনাদি চৌধুরীর ওয়াইফ জয়ার
থেকেও ওই একই বুলি বেরুচ্ছে। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে

পারছি না কেমন করে তিনজন সধবা ভদ্রমহিলা একসঙ্গে একই রক ক্ষেপে উঠতে পারেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা কি আর কোথাও আর কখনও ঘটেছে?

পরেশ ঘোষাল জোর দিয়ে বললেন—না। পৃথিবীর ইতিহাসে পাবেন না। ওয়ার্ল্ডের ইতিহাস আমি গুলে খেয়েছি।

মিসেস মুখার্জি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, মুখার্জি সাহেব বাধা দিয়ে বললেন—নো। তুমি ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এস-সি ফেল করেছ, হিস্ট্রি সম্পর্কে কিছু বলার তোমার এক্তিয়ার নেই।

চোখমুখের অবস্থা দেখে মনে হল মিসেস মুখার্জি দুঃখ পেয়েছেন। হয়তো হিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি-এ ফেল না করার জন্য দুঃখ হয়েছে, কিন্তু আপাতত সে-বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার দরকার নেই।

চোখে জল ছিল না। তবু হাত দিয়ে চোখের জল মুছে নেওয়ার করুণ ভঙ্গি করে মিসেস মুখার্জি বললেন—আধঘণ্টা বাদে তুমি তো ডাক্তার নিয়ে অনাদি চৌধুরীর বাড়িতে যাবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব, জয়াকে একবার দেখে আসব, ডাক্তার কী বলেন শুনব।

মুখার্জি সাহেব বললেন—সময়মতো রিসিভার যথাস্থানে রাখব। তারপর মিস্টার ঘোষালকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, ইচ্ছে হলে তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারো। কিন্তু ডাক্তারের বাড়ি তো দূরের কথা অনাদি চৌধুরীর বাড়িতে পর্যন্ত যাব না।

মিসেস মুখার্জি অবাক হয়ে বললেন—টেলিফোনে যে বললে...

মুখার্জি সাহেব শান্তভাবে বললেন—টেলিফোনে যা বলা হয় তা হাতে-কলমে করতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি টেলিফোন ডিরেক্টরি খুলে নিয়মাবলী পড়ে দেখতে পারো।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন মুখার্জি সাহেব। আধঘণ্টা হয়ে গেছে। রিসিভারটি তুললেন। গরম গলায় অনাদি চৌধুরী তখন সমানে তুবড়ি ছোটিয়ে যাচ্ছেন। বিনাবাক্যব্যয়ে মুখার্জি সাহেব সন্তর্পণে রিসিভারটি যথাস্থানে রেখে দিলেন। বললেন—মিস্টার ঘোষাল, জরুরী কোনও কাজ না থাকে তো আপনিও আমার সঙ্গে চলুন। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। শেষ পর্যন্ত দেখি।

পবেশ ঘোষাল উদাস গলায় বললেন—আপনাব সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনও জরুবী কাজ নেই।

মিসেস মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আমিও যাব। বিপদ-আপদের সময়েও যদি মানুষেব পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলাম তো বেচে থেকে লাভ কী।

মুখার্জি সাহেব আপত্তি কবলেন না। তিনজনে গাড়িতে উঠলেন। মুখার্জি সাহেব আস্তে আস্তে বললেন—বিপদ-আপদের সময়ে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো ভালো। না হলে অনেক মানুষ বিপদ-আপদ থেকে অনায়াসে নিস্তাব পেয়ে যায়।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো—না, অনাদি চৌধুবীর বাড়ির সামনে নয়—মাধব গোস্বামীর বাড়ির দরজায়। কিন্তু গাড়ির শব্দ শুনে মাধব গোস্বামী বেরিয়ে আসেননি, বেরিয়ে এলেন সলিল গুপ্ত। বললেন, মুখার্জি সাহেব, আপনি ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছেন। আপনি না এলে আমি আর মাধব এক্ষুনি আপনার বাড়িতে যেতাম। আমরা দুজনেই একটা যাচ্ছেতাই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি।

মুখার্জি সাহেবের উপর সকলেরই অগাধ আস্থা। সকল সমস্যার সমাধানে উনি সিদ্ধহস্ত। সমস্যা এমন জটিল যে ভদ্রতার খাতিরেও কেউ পরেশ ঘোষাল বা মিসেস মুখার্জির দিকে তাকাচ্ছেন না। মুখার্জি সাহেব ছাড়া জগতে এখন আর সব অবান্তর।

অকুস্থলে মাধব গোস্বামীর ওয়াইফ (রাধা) এবং সলিল গুপ্তের ওয়াইফ (লীলা) উপস্থিত আছেন।

মুখার্জি সাহেব কোনও অবান্তর কথার ধার দিয়েও গেলেন না। সরাসরি বললেন—মিসেস গোস্বামী, আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তো আপনি আপনার স্বামীকে এমন তিনটি বাক্য বলেছেন যার ফলে আপনার স্বামী হতভম্ব হয়ে পড়েছেন। কারেক্ট?

মিসেস গোস্বামী ঘাড় নেড়ে জানালেন—কারেক্ট।

মাধব গোস্বামী কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, মুখার্জি সাহেব হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—শাট আপ। খুব সীরিয়াস কেস। এখন আপনি ইণ্টারফিয়ার করবেন না, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

কিছু ভণ্ডুল করতে চান না বলে মাধব গোস্বামী মুখ বন্ধ করে রইলেন।

মুখার্জি সাহেব আবার তাকালেন মিসেস গোস্বামীর দিকে। বললেন—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তিনটি বাক্য। আপনি যদি অনুমতি করেন তো সেই তিনটি বাক্য আমি আবৃত্তি করি, ভুল হলে আপনি শুধরে দেবেন।

—আবৃত্তি করুন।

গলা সাফ করে নিয়ে মুখার্জি সাহেব আবৃত্তি করলেন—গত চার বছরও প্রত্যেকবার তে-রাত্তির বাইরে কাটিয়ে এসেছ। আমি কিছু বলিনি। কিন্তু এবার আমিও সঙ্গে যাব।

মিসেস গোস্বামী অবাক হয়ে বললেন—একটি অক্ষরও ভুল বলেননি। কী করে জানলেন, কী করে পারলেন?

নিজের কপালে কয়েকটি টোকা মেরে মুখার্জি সাহেব বললেন—সারাজীবন রাজ্যের ডিটেকটিভ বই গোগ্রাসে গিলেছি, এটুকু জানব না, এটুকু পারব না? বিদ্যাচর্চা কি কখনো বিফলে যায়? আপনি কী বলেন মিসেস গুপ্ত?

মিসেস গুপ্ত হাতজোড় করে বললেন—আমার তিনটি বাক্য আপনি দয়া করে আবৃত্তি করবেন না, আমি স্বীকার করছি যে আমার স্বামীকেও আমি হুবহু এই তিনটি বাক্যই বলেছি; গত চার বছরও প্রত্যেকবার তে-রাত্তির বাইরে কাটিয়ে এসেছে। আমি কিছু বলিনি। কিন্তু এবার আমিও সঙ্গে যাব।

নির্ভুল। কাঁটায়-কাঁটায় নির্ভুল। মুখার্জি সাহেব খুকখুক করে হাসলেন। বললেন—দেখা যাচ্ছে যে পাঁচজন ভদ্রমহিলা হুবহু একই রকম তিনটি বাক্য যে যার নিজের স্বামীকে বলেছেন। ফলে এবার পাঁচজন স্বামীও হুবহু একই রকম কাজ করবেন না, তে-রাত্তিরের বদলে সাত রাত্তির বাইরে কাটাবেন। এই আমার ফাইন্যাল ডিশিসন।

মিসেস মুখার্জি মিহি গলায় বললেন—আমরা পাঁচজন জীবন-সঙ্গিনীও সঙ্গে যাব তো?

টেবিলে ঘুষি মেরে মুখার্জি সাহেব বললেন—অসম্ভব টু দি পাওয়ার ফাইভ।

কমণ্ডলু, নামাবলী, জপমালা-টপমালা নিয়ে মুখার্জি সাহেব, পরেশ ঘোষাল, অনাদি চৌধুরী, সলিল গুপ্ত আর মাধব গোস্বামী সোমবার রওনা হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এবার মিসেস মুখার্জিও রণকৌশল ঠিক করে ফেলেছেন।

উঁহু, ভুল বলা হল। আগেই সব ঠিক করে রেখেছিলেন কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু জানতে দেননি।

টেলিফোনে আর্জেন্ট তলব পেয়ে মিসেস মুখার্জির বাড়িতে চলে এলেন পরেশ ঘোষাল, অনাদি চৌধুরী, সলিল গুপ্ত আর মাধব গোস্বামীর জীবনসঙ্গিনীরা।

মিসেস মুখার্জি বললেন—দেখুন, এভাবে ছেড়ে দিলে শেষপর্যন্ত হয়তো আমরা অতলে তলিয়ে যাব। আজকাল অনেক মানুষই সাধুসন্ন্যাসীর ভক্ত হয়ে পড়েছেন, দু-চার ফোঁটা ভক্তি-টক্তিতে কোনও ভয় নেই, কিন্তু বেশী টান হয়ে গেলে হয়তো চিরকালের জন্য সংসার-টংসার ছেড়ে চলে যেতে পারবেন। তখন আমাদের কী উপায় হবে?

চারজন ভদ্রমহিলা সমান ছন্দে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মিসেস মুখার্জি গলা চড়িয়ে বললেন—দীর্ঘশ্বাস দিয়ে দুর্গতি এড়ানো যায় না। আমাদের স্বামীরা সন্ন্যাসী হয়ে গেলে সমাজে কি আমরা মুখ দেখাতে পারব? আমাদের রূপগুণ সম্পর্কে সমাজের আর কোনও শ্রদ্ধাই থাকবে না। অঢেল রূপগুণ থাকা সত্ত্বেও আমি—মানে আমরা—কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব?

চারজন ভদ্রমহিলার চোখে জলবিন্দু দেখা দিল।

একটা মস্ত ম্যাপ টেবিলে বিছিয়ে মিসেস মুখার্জি বললেন—চোখের জল মুছে ফেলুন, ঝাপসা চোখে ম্যাপ ঠিকমতো দেখা যাবে না।

চোখের জল মুছে চারজন ভদ্রমহিলা ম্যাপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

কিন্তু হায়, মিসেস মুখার্জি যাই বলুন ম্যাপ দেখে কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। সবুজ রঙ মানে রেললাইন, লাল রঙ মানে

ট্টবাস, হলুদ রঙ মানে প্রাইভেট বাস, নীল রঙ মানে সাইকেল রিক্সা
ার গোলাপী রঙ মানে হাঁটা পথ।

মিসেস মুখার্জি বললেন—আব সব যেমন-তেমন, এই হাঁটাপথেই
সুবিধাব চূড়ান্ত। পাকা আঠারো কিলোমিটার বাস্তা হেঁটে যেতে
বে, কোনো উপায় নেই। এই কষ্টটুকু আমাদের স্বীকার করতেই
বে।

মিসেস মুখার্জিব কাজে কোনও ত্রুটি নেই। বাস্তার সকল হিসেব
াঁব নখদর্পণে। ম্যাপেব মধ্যে অকুস্থল চকচক কবছে।

আপত্তির কোনও প্রশ্নই ওঠেনি, সকলে মুহূর্তে একমত হয়ে গেলেন।
চক্ষে দেখে আসা যাক পাঁচজন সাধক কোন্ সাধনায় মগ্ন হয়ে
আছেন।

শুভলগ্ন দেখে পাঁচজন ভদ্রমহিলা বওনা হলেন।

রাস্তার কষ্টের নিশানা কোনও ম্যাপেই ফলাও করে লেখা থাকে
না। অতএব রাস্তার কষ্টের খুঁটিনাটি বিববণ অবান্তর। ট্রেন, স্টেট-
বাস, প্রাইভেট বাস আর সাইকেল রিক্সাব ধকলেই পাঁচজন ভদ্রমহিলা
যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছেন, কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না, এখনও
আঠাবো কিলোমিটাব হাঁটারাস্তা বাকি।

হাঁটারাস্তাও পার হয়ে পাঁচজন ভদ্রমহিলা মস্ত একটা পুরনো বাড়িব
সামনে এসে দাঁড়ালেন। অঢেল রূপগুণ সত্ত্বেও পাঁচজন ভদ্রমহিলার
দিকে তাকালে তখন মনে হয়—। না, থাক, মনের কথা মনেই থাক।

ভাগ্য ভালো বলতে হবে, বাড়ির সামনে একজন দারোয়ান
মোতায়েন আছে।

মিসেস মুখার্জি তাকে জিজ্ঞেস করলেন—এই বাড়িটাই কি এড-
ওয়ার্ড সাহেবের নীলকুঠি?

দারোয়ান ঘাড় নেড়ে বলল—হ্যাঁ। কিন্তু বাড়িটা এখন খা
নেই।

মিসেস মুখার্জি বললেন—জানি। পাঁচজন সাহেব সাতদিনের জ
দখল নিয়েছেন। ঠিক তো।

সন্দেহের চোখে দারোয়ান একবার পাঁচজন ভদ্রমহিলার মুখে চো
বুলিয়ে নিল। বলল—ঠিক। মুখার্জি সাহেব, ঘোষাল সাহেব, চৌধু
সাহেব, গুপ্ত সাহেব আর গোস্বামী সাহেব।

দলের চারজনের দিকে তাকিয়ে মিসেস মুখার্জি শান্তভা
হাসলেন। ম্যাপে ভুল নেই। রাস্তার সকল কষ্ট সার্থক। যথাস্থা
উপস্থিত হওয়া গেছে।

মিসেস মুখার্জি বললেন—আমরা ভেতরে গিয়ে সাহেবদের স
দেখা করব।

দারোয়ান আপত্তি করে বলল—হবে না। কেউ সজ্ঞানে নেই।

মিসেস মুখার্জি বললেন—জানি। কিন্তু আমাদের দেখলেই ওঁদে
জ্ঞান ফিরে আসবে।

—হুকুম নেই। আমি যেতে দিতে পারব না।

মিসেস মুখার্জি রাগ করে বললেন—হুকুম-ফুকুমের পরোয়া ক
না। ঢুকে স্বচক্ষে দেখব।

—কী দেখবেন, কাকে দেখবেন স্বচক্ষে? প্রত্যেকেই বোত
বোতল মদ টেনে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। আর কেনই বা দেবেন না। গ
চারবছর তে-রাত্তির চালিয়েছেন। এবার শুনছি সাত রাত্তিরে
প্রোগ্রাম।

শুনে পাঁচজন ভদ্রমহিলাই হুড়মুড় করে ঢুকতে যাচ্ছিলেন কি
দারোয়ান দু-হাত ছড়িয়ে রাস্তা আটকে দাঁড়াল। দুঃখ করে বলল—হা

না, হবে না, হবে না। গত চারবছর প্রত্যেকেই মেয়েমানুষ নিয়েছেন, কিন্তু এবার আপনাদের সেই আশায় ছাই, এবার আপনারা ভালোয় ভালোয় বিদায় হয়ে যান, কারণ এবার প্রত্যেক সাহেবই যে যার নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। একেকটি স্ত্রী যেন একেকটি ডানা-কাটা পরী। অমন স্নুন্দরী স্ত্রী থাকতে কেন যে সাহেবেরা আপনাদের মতো পেত্নীদের পাত্তা দেন কে জানে।

ইষ্টদেবী

ত্রিলোচন কলমচী

লাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ডের বাইশ আউন্স টাক উর্দু বয়ান গলাধঃকরণ করে নির্ভেজাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের মত যখন সশরীরে বাইরে এসে দাঁড়ালাম তখন টু-সীটারগুলো একেবারেই ধর্তব্যের বাইরে, এমন কি চৌরঙ্গী ফট্‌ফটিয়ারও সুখের সওয়ারী নিয়ে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে ; জামাই গরবিনীর মত জমকালো টুরিষ্ট বাসটিও যখন গগলস-গবাক্ষে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গীয়ার বদলালো তখন আমি পতিব্রতা শকুন্তলার মত পদব্রজে বাসষ্টপের দিকে রওনা দিলাম।

কলকাতায় বাসা এবং দিল্লীতে বাস দুই-ই কালেভদ্রে চোখে পড়ে, তাও খালি অবস্থায় না, নয়া দিল্লীতে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অনায়াসে আপনি আনন্দে বড় হতে পারেন। কিন্তু বড় হওয়ার পথ পর্যন্তও আমাকে পৌঁছতে হল না, প্রায় নিতম্ব ছুঁয়ে একটি ধারালো হর্ন বাজালো। শিঙের গুঁতো খাওয়ার মতই পথের কিনারে ছিটকে গিয়ে ফিরে তাকালাম। দেখি স্কুটারের উপরে সিংহ বাঘিনীর মত কে একটি মূর্তি বসে ছিপিখোলা সোডার বোতলের মত খিকখিকিয়ে হাসছে।

পিত্তি জ্বলে গেল। পাষাণী আর কাকে বলে। দেহলি অঙ্গনাদের হৃদয় বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে!

'কি কেল্লা ফতে হল?'

চমৎকৃত হলাম প্রশ্ন শুনে, পা-টেপা শালোয়ার আর কোমর কামড়ানো কামিজের অভ্যন্তর থেকে একেবারে আ-মরি বাংলা ভাষা! জবাব দিলাম সঙ্গে সঙ্গে।

'লাল-কেল্লা তো ফতে করেই বেরিয়েছিলাম। এবার বুঝি নিজের—'

'দৌড় কদ্দুর?'

'আপাততঃ ঐ বাস ষ্টপেজ।'

'তারপর।'

'আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না তো?'

'এত এক্ষুনি চিনতে চান!' হেসে উঠল রমণী মূর্তিটি, কদ্দুর? কোথায় যাবেন বলুন না। কুড ড্রপ য়্যু এনি অয়্যের—'

এ আর নতুন কথা কি! বেমক্কা ড্রপ করাই তো তোমাদের কাজ সুন্দরি। ড্রপার মহিলাটির দিকে তাকালাম। বাঙালী। চেনা চেনা লাগছে, অচেনা-অচেনাও। মেয়েরা যাহা বাহান্ন তাহা তেপান্ন মনে করে বললাম, 'এনি হয়্যার! কেরলবাগ, মালবীয় নগর, লোধী কলোনী কিংবা গ্রীন পার্ক কিংবা—'

'দোহাই! নিউ দিল্লীর ভূগোল মুখস্থ করার সময় নেই। উঠে আসুন।'

শিউরে উঠলাম, এ বলে কি। আস্ত এই লাশ নিয়ে ওই স্কুটারে উঠবো কি করে! উঠলেও সেফ্‌টি ক্যাচ-ক্যাচ বলে তো কিছুই নেই, লেডিজ বলে কথা, যে কোনো মুহূর্তেই আউট হবার বিস্তর সম্ভাবনা।

প্রেমে পতনের অভ্যেস থাকলেও স্কুটারে নিপাতনে সিদ্ধ হইনি এখনো। ইতস্তত করছি দেখে স্কু-রঙ্গিণী বলল, 'ভয় নেই, ওই বহাল তবিয়তেই পৌঁছে দেব। কথায় শেষে কর্ক-স্ক্রুর মত প্যাঁচালো হাসি হাসল মুখ মুচকে।

উঠলাম। বাসে ওঠার দুর্ভোগের চেয়ে এ দুর্ভাগ্য তবু ভালো।

'আরে মশাই ধরুন তো ভালো করে, পড়ে যাবেন শেষ কালে—'

'কি ধরবো?' আমি হতভম্ভ হয়ে বলি।

'কেন, পেটে ধরুন, পেটে!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল আমার অপরিচিতা।

অনেক দুঃখেও মুখে রসিকতা এসে যায় আমার। বললাম, 'ওটা তো আপনাদেরই একচেটিয়া, মেয়েদের পেটে ধরার সামর্থ্য আমাদের নেই। আই মীন আমার নেই।'

স্টার্ট নিতে নিতে খিলখিলিয়ে হাসল, 'ব্যস আর না?'

সন্ত্রস্ত হয়ে হাত গুটিয়ে নিচ্ছিলাম এমন সময় পুনরুক্তি হল, 'যত-ক্ষণ গাড়ি চালাবো একদম হাসাবেন না। তামাশা-বিজনেস করতে গিয়ে শেষে কি প্রাণে মারা যাবেন?'

হাসতে হাসতে মানুষ খুন হয় বলে আগেও শুনেছি, কোনো কথা বললাম না। শুধু মনের মধ্যে এতক্ষণে ভাবনা এল, কে এই ষড়-বিংশতি বালিকা (ষড় ত্রিংশতিও হতে পারে, মেয়েদের বয়স মানেই কসমোপলিটন মেক-আপ) যে আমাকে নিয়ে এভাবে খেলছে? আমার জীবনে কি কেবলি অতি নাটক? পাঠকরা আর কাঁহাতক সহ্য করবে! না কি আমাকে স্মৃতিভ্রংশেই ধরেছে, ভুলে যাচ্ছি সব কিছু বেমালুম? মেয়ে মানেই ভ্যানিশিং ক্রীম নয়। কলেজ জীবনে নীট আশিটি মেয়ের মুখ চিনতাম। ইউনিভার্সিটির দু-বছরেও কোননা শ'দুয়েকের। সেই

রং-মশাল জ্বলা দিনগুলোর সহযাত্রিণীরা সব গেল কোথায় তবে? এই দীর্ঘ কয়েক বছরের মধ্যে খুব বেশী হলেও সতের জনের সঙ্গে ফিরে দেখা হয়েছে আমার। বলা ভালো, সনাক্ত করতে পেয়েছি মাত্র জনা-সতেরকে। বাকি মেয়েদের সবাই গাঢাকা দিয়েছে, এ-জীবনে সম্ভবত তাদের আর খুঁজে পাবো না। কিন্তু এই মুহূর্তেই যার পিছু নিয়েছি সেই অগ্রযাত্রিণী কি আমার একদা কালের ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাওয়া সেই চারশ' আশি জনের কোনো এক মূর্তি হতে পারে না?

ট্রাম কোম্পানীর ট্রাঙ্ককলের মত চেঁচিয়ে পিছন থেকে কথা শুরু করে দিলাম, 'দিল্লীতে কদ্দিন আসা হয়েছে?'

'সাত বছর। আপনার?'

'সাত দিনও হয় নি। এখানে কি করেন?'

'সংসার আর সরকারী চাকরি। আপনার মেয়েলি ব্যবসা কেমন চলছে?'

'মেয়েলি ব্যবসা?'

'মানে মেয়েদের নিয়ে। কত করে ব্যাচেন এক একটাকে? কত করে দেয়?'

'বুঝলাম না। কিন্তু না বুঝলেও, কোনো অবৈধ কারবারে আমি নেই, তা আগে থেকে স্পষ্ট জানিয়ে রাখছি।'

'বটে! ন্যাকামি রাখুন। আমাকে নিয়ে যেন কিছু লিখে ফেলবেন না ফিরে গিয়ে। অনেকখানি লাই পেয়েছেন তো! আপনার মত ছোঁয়াচে লোককে—'

কথা শেষ করল না হঠাৎ প্রায় টাল খেতে খেতে স্কুটার ঘুরিয়ে নিল সে। এসব ছিটিয়াল মেয়েকে কিছু বিশ্বাস নেই, হয়তো কোর্টের সামনের সেই সাবেক জায়গায় গিয়ে বলবে, নামুন, সুড়সুড় করে

নেমে যান!' কথাটা মনে হতেই আতঙ্কিত হয়ে বলি, 'কি হল?'

'নাথিং।' কয়েক গজ ফিরে গিয়ে পথের ধারে থামালো গাড়ি-খানাকে 'নামুন'।

আমি নামতেই হুড়মুড়িয়ে মেয়েটিও নেমে পড়ল, তারপর স্কুটারকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে রেখে ছুটে গেল পাশের জমিতে।

'আসুন আসুন, দেখে যান, হাউ-বি-উ-টি ফুল—'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমিও ডগমগ ছুটলাম কিন্তু বিউফুলটিকে কোথাও দেখতে পেলাম না। বঙ্গদেশের ছুঁড়তি ছাত্ররা ক্ষমা করবেন, নীরেট বেহদ্দ গুটি চারেক আস্ত থান পরে আছে দেখলাম।'

'কী রকম ফিগার দেখেছেন? একটু চোকলা পর্যন্ত খসে নি।'

কোনো খোদ পাগলীর হাতে পড়েছি বুঝতে পেরে প্রমাদ গুণলাম। পাথীনারী বিবর্জিতা খুব পোড় খাওয়া কোনো আদমীই বলে থাকবেন সম্ভবত। মেয়েটি ততক্ষণে মাটি থেকে খানদুই ইট তুলে নিয়েছে।

'নিন। বাকী দুখানা কাইগুলি আপনিও তুলে নিন।'

আমি কাইগুলি হুকুম তামিল করতে করতে ভাবলাম, 'এইবার নিজের মাথায় মারুন' বা এই রকমই কোনো অবশ্যম্ভাবী প্রস্তাব আসবে। কিন্তু না, কিছুই হল না। শুধু চার চারখানা থান ইট কোলে করে, অনেক কসরত খাটিয়ে ফের বসতে হল গিয়ে মেয়েটির পিছনে। কোনো কথার জবাব নেই, টুঁ শব্দ করেছি কি বলে, 'প্লিজ—'

কয়েক মিনিট সীটের ওপরে প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সিঁটিয়ে বসে থাকলাম বাংলাদেশের মাননীয় মন্ত্রীদের মত, এক একটি মোড় আসে আর মনে হয় 'নো মোর' এই বুঝি গেলাম কিন্তু কোনো গতিকে টিকে যাই, অবশেষে যেখানে এসে স্কুটার থামল সেটি আমার প্রস্তাবিত 'এলি

হয়্যার' এর কোনোটিই নয়! একেবারে বিলকুল অন্য পাড়া। আর নয়া-দিল্লীতে অন্য পাডা মানেই আমার মত নয়া আগন্তুকের কাছে অন্য দরিয়া।

একটি কোয়াটারের কম্পাউণ্ডের সামনে এসে সুইচ অফ করে এক সেকেণ্ড কি ভাবল তারপর বলল, 'এইটি আমাদের কোয়ার্টার। কিন্তু এই রাত্রে আপনাকে আর ভিতরে নিয়ে যাওয়া চলবে না। আমার স্বামী আবার একটু কনজারভেটিভ আছেন, মানে সেণ্ট পার্সেণ্ট বাঙাল, বাড়িতে আমার কোনো পুরুষ বন্ধুকে টলারেট করতে পারে না।'

আমি আতঙ্কিত হয়ে বললাম, 'আরে না না, তার প্রয়োজন নেই। ইটগুলো কি করবো এবার।'

বাড়ির সামনের জমিতে একটা ইটের পাঁজা দেখিয়ে মেয়েটি বলল, 'ওই ওর ওপর কাইগুলি রেখে দিন। ওগুলি সবই সেল্ফ-কালকশন।'

শ'দুয়েক ইটের একটি পাঁজা তাতে আমার চারখানাও যোগ হল। বললাম, 'এত ইট কি হবে? উনুন করতে তো—'

'উনুন! আপনিও দেখছি আমার স্বামীর মতই। পুরুষরা না সত্যি যা ন্যাকা হয়—' স্ট্রীট লাইটের আলোয় হাসল মেয়েটি, 'এই কামিং মার্চে আমরা বাড়ী শুরু করবো, আর. কে. পুরম—এর দিকে জমি কিনেছি, মশাই। আচ্ছা, গুড নাইট। সী ইউ এগেন—'

'অ্যাজ ইউ লাইক ইট,' আমি পথের হদিশ পর্যন্ত জিজ্ঞেস না করে জোরে হাঁটা দিলাম।

হৃদয় চাঁদের প্রেমের বাগানে

সত্যেন্দ্র আচার্য

সিংহ লগ্ন আর মিথুন রাশি নিয়ে জন্মেছিলেন বক্রেশ্বরবাবু। বিষয়-বুদ্ধিতে তাঁর জুড়ি নেই এবং প্রচণ্ড ধুরন্ধর বলে প্রভূত খ্যাতি ছিল বক্রেশ্বরবাবুর! দ্বিতীয় খ্যাতি তাঁর কবিরাজিতে। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ কবিরাজ এবং খেতাব ছিল, একটা নয়—দু দুটো। ভেষকাচার্য এবং কবিশিরোমণি। কিন্তু বেজায় ক্ষোভ ছিল বক্রেশ্বরবাবুর, হৃদয়চাঁদ যোগ্য, পুত্র হল না বলে। হৃদয়চাঁদের লগ্নপতি সিংহ নয়, আবার রাশিটাও কন্যা।

কিন্তু তাতে কি, জীবনে ফাঁকি বস্তুটি কি, সে ব্যাপারে হৃদয়চাঁদ পোক্ত। হৃদয়চাঁদ ফাঁকি দিয়ে লেখাপড়া করেছে। ফাঁকি বলতে শেষ তিনটি বছর কলেজের মাইনে জুগিয়েছে বন্ধুরা। কারণ, ফাঁকি দিয়ে কেমন করে তালগোলে একটা মেয়েকে কাজে নামাতে হয়, তার শিক্ষা দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। টুকে টুকে সব কটা সিঁড়ি পার হয়ে দিব্যি গ্রাজুয়েট হয়ে বিদ্যা দিগ্‌গজ হল। সেই একবার বাবা হৃদয়চাঁদকে ডেকে বলেছিলেন, তুই সরস্বতীর বরপুত্র, আমার যোগ্য

আমি ? উর্বশী বুকে হাত ছুঁইয়ে বলল, তোমরা হলে পুরুষ মানুষ, বীরের জাত। তুমি বল। কত সাহস তোমার।

একটু আমতা আমতা করে হৃদয়চাঁদ বলল, সাহস-টাহসের কথা এটা নয়, জীবনের কথা। নারীরাই বা পুরুষের পেছনে থাকবে কেন, তলায় পড়ে শুধু মার খাবে কেন? হৃদয়চাঁদ বলল, নারীপুরুষ সমান এখন। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে এসেও তুমি একথা বলছ? তোমরা পেছিয়ে কিসে, পুরুষরাই বা তোমাদের ওপরে উঠবে কেন?

শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত কিছুই হল না। ওরা উঠল। হৃদয়চাঁদ চুপচাপ হাঁটছিল। উর্বশী এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কই, সে কথা তো আর কিছুই এগোল না?

কী কথা? হৃদয়চাঁদ যেন আকাশ থেকে পড়ল। জীবনের কথা?

বিড়ালাক্ষী, কেশুত্তে পাতা?

ওটা তো এখন আমার ভাবনা। তোমার ভালমন্দ এখন আমার। হৃদয়চাঁদ বলল, আমি তো কথা দিয়েছি, ব্রণর ঝাড়বংশ নির্মূল করব। চুল গজিয়ে ছাড়ব।

উর্বশী আবার হাঁটল। হৃদয়চাঁদ বলল, যদি জোনাকি পেতাম গড়ের মাঠে?

কেন? উর্বশী খুব অবাক গলায় বলল।

মুঠো মুঠো তোমার খোঁপায় ছড়িয়ে দিতাম।

আমার খোঁপা তো নকল।

তাতে কি? খোঁপা তো বটে।

উর্বশী বেজায় গর্ব বোধ করল। বলল, তুমি কবি। খালি আমাকে সাজাতে চাও। উর্বশী হাসি হাসি ঠোঁটে বলল, কী যেন

একটা গান আছে না, কি যেন, উর্বশী ভেবে ভেবে বলল, সাজাব যতনে মুক্তো ঝোলাব···

কে আর না চায় বল, তার প্রেমিকাকে সাজাতে? হৃদয়চাঁদ উদাত্ত গলায় বলল, আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করি, বিজ্ঞান আমাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নাই বা হল কেশুত্তে পাতা, চিৎপুরে পরচুলা নেই?

সে আবার কি?

যাত্রায় দেখ না? হৃদয়চাঁদ যাত্রাদলের হিরোর মত চোখ আর গলা করে বলল, মহাদেবের জটা, সাজাহানের পাকা চুল, পদ্মিনীর আজানুলম্বিত কেশরাশি, অশোকবনে বন্দিনী সীতাদেবীর এলোকেশ, আধুনিক চরিত্রের ববছাঁট, এমনকি চানক্য পণ্ডিতের টাক পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায়। এটা কলকাতা। ভারি তো বিড়ালাক্ষী আর কেশুত্তে পাতা?

উর্বশী গায়ে গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে হাঁটল এবার। যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে যেতে চাইল। বলল, সত্যি তুমি কত জানো। তোমার জ্ঞান কত টনটনে। তোমার কাছে আমি কি!

তুমি পাশে থাকলে আমি—

ভুরু ওপরে তুলে উর্বশী অন্ধকারে ভেঙাল। আমি পাশে থাকলে তুমি কি—

এই গড়ের মাঠে কেন, হৃদয়চাঁদ বীরের মত বলল, অন্ধকারে সুন্দরবনের গভীরে পর্যন্ত চলে যেতে পারি।

তুমি বীর। উর্বশী গর্ব অনুভব করল। নেতাজীর মত সাহস তোমার। উর্বশী এবার সলজ্জ বলল, জীবনে আমি ঢের ঢের পুরুষ দেখেছি, কিন্তু তোমার মত হৃদয় দেখিনি কখনো। তুমি আমার জীবনের জগন্নাথের রথ।

সে আর এমন কথা কি! হৃদয়চাঁদ বলল, তুমি যে আমার জীবনে সপ্ত সারথি।

উর্বশী আরো গর্বিত হল। কিন্তু হৃদয়চাঁদ যেন একটু চুপসে গেল। তারবার উর্বশীর চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল।

তবু যাই হোক সপ্ত সারথি বলে ফেলেছে, ভাগ্যিস, সপ্তম সারথি বলে ফেলেনি? কিন্তু হিসেব মত হৃদয়চাঁদ দেখল, উর্বশীই সপ্তম। পাঁচে পঞ্চবাণ, ছয়ে ঋতু, সাতে উর্বশী।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ছোটবেলাকার কথা। বলা যায় ইয়ের লাইনে অ, আ, ক, খ। হাতে খড়ি। চতুর্থটি জমাটি প্রেম। তখন হৃদয়চাঁদ কলেজে পড়ে। মেয়েটির এদিকে সব মোটামুটি ভালই, শুধু কানে একটু কম শোনে।

হৃদয়চাঁদ একদিন গঙ্গায় নৌকা চড়তে চড়তে কাব্য করে কথা বলছিল। দেখ ময়না, এই পৃথিবী কত সুন্দর। তারই বক্ষে আমার দুটি কপোত-কপোতী।

ময়না সব সময়ই সলজ্জ তাকাচ্ছিল, এবং দাঁত দিয়ে নক কাটছিল। বলল, তপতী আমার ভাল নাম।

হৃদয়চাঁদ আগেই ময়নার পয়সায় প্রেমসে মোগলাই পরটা খেয়েছে এসপ্লানেডে। এক প্যাকেট দামী সিগারেট কিনে দিয়েছে ময়না। এখন দশ টাকা খরচ করে গঙ্গায় নৌকা চড়াচ্ছে। সন্ধ্যার মৃদুমন্দ হাওয়া খাওয়াচ্ছে। হৃদয়চাঁদ সুখটান মেরে সিগারেটের শেষ টুকরো গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, কেন, টিয়া?

কেয়া আমার ছোট বোন।

সূর্য যখন ডুবছিল, তখন মোগলাই পরটা চিবোচ্ছিল হৃদয়চাঁদ। এখন চাঁদ উঠেছে আকাশে। ফুরফুরে বাতাসে বাবরি চুল লুটোপুটি

খাচ্ছে হৃদয়চাঁদের মাথার ওপর। হৃদয়চাঁদ একটা আরামের ঢেকু
তুলে আবার কাব্য করল, আমরা যেন সাত সমুদ্র তের নদীর পা
কোন নাম না জানা অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছি। তুমি আমার পা
বসে আছ। কপালে তোমার কনে চন্দন।

নন্দন আমার মেজভাই।

হৃদয়চাঁদ ওর কপাল দেখল। ময়না লজ্জা পেল। চোখ নামাল
দাঁত দিয়ে নখ ছিঁড়ল। হৃদয়চাঁদ এবার ওর আঙুল ছুঁল। ছুঁ
আবার কাব্য করল, আমরা যাচ্ছি, কোন্ সুদূরে চলে যাচ্ছি। তু
পাশে বসে আছ, আমি হাল ধরেছি।

কাল? আসব।

হৃদয়চাঁদ বেজায় খিঁচড়ে গিয়েছিল। আর আসেনি হৃদয়চাঁদ।

তখন হৃদয়চাঁদ খুঁজতে খুঁজতে পঞ্চম প্রেমিকা পাকড়ালো। দেখতে
শুনতে ভালই। কানেও কম শোনে না, চোখেও কম দেখে না। কি
বড় বড় কথা বলে। প্রথম প্রথম হৃদয়চাঁদকে চিঠি লিখত মেয়েটি
চিঠির ওপর লেখা থাকত, "গড ইজ অলমাইটি।"

ওসব ওপর-টোপর নিয়ে হৃদয়চাঁদের অত মাথাব্যথা নেই, নিচেটা
আসল। চিঠি তখন গোগ্রাসে পাঠ করত হৃদয়চাঁদ। কিন্তু ইংরেজ
শব্দ এবং কোটেশান থাকত প্রচুর। একদিন একটা বাক্যে বেজা
আটকে গেল হৃদয়চাঁদ। "এ বার্ণট চাইলড ড্রিমস দা ফায়ার"। যদি
হৃদয়চাঁদ বাহাত্তরের বরপুত্র, সসম্মানে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, কিন্তু তর্জম
করতে করতে সারা রাত্তির ঘুম এল না। প্রেমপত্র, ফলে ভেষকাচা
পিতাকেও দেখতে পারে না। অবশেষে মুরুব্বী ধরল, বলরামদাকে
যিনি র‍্যাশনশপে ক্যাশমেমো লেখেন এবং সপ্তায় দুদিন রাষ্ট্রভাষা শিক্ষ
করেন।

পুত্র হৃদয়চাঁদ। স্ত্রীকে নিভৃতে ডেকে বলেছিলেন, হৃদয়চাঁদ দুনিয়ার সেরা সুন্দরীদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে গেল।

হ্যাঁ, এই হৃদয়চাঁদ। এই হৃদয়চাঁদ প্রেম করে বর্তমানে এমন একটি মেয়ের সঙ্গে যার মুখ মণ্ডলে গোটা পঞ্চাশ ব্রণ এবং মাথার চুল সাদা কালোয় ফিফটি ফিফটি। এবং তাও খুব পাতলা। প্রায় ফর্সা হতে চলেছে। হৃদয়চাঁদ উর্বশীর মুখ আর মাথায় বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলত, জীবনে আমি যা চাই, তা তোমার ভেতর পেয়ে আমি ধন্য।

কী চাও, কী চেয়েছ জীবনে? উর্বশী হাসি হাসি মুখ করে তাকায়।

হৃদয়চাঁদ ওর মুখের দিকে তাকায়। ওর মাথার দিকে তাকিয়ে থেকে আরো গম্ভীর গলায় বলে, জীবনে কী চাই, তা তুমি বোঝ না?

চোখ নামায় উর্বশী। হৃদয়চাঁদ একটু কেশে নিয়ে বলে, তোমার ব্রণ আমি নির্মূল করব, তোমার চুল আমি উঠিয়ে ছাড়ব। মেঘমেদুর আকাশের মত ভ্রমরকৃষ্ণ তোমার মাথা ভরে যাবে আবার। বাবা ভেষকাচার্য, তোমার আবার ভাবনা?

ঠিক বুঝতে পারে না উর্বশী। হৃদয়চাঁদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। অভিমান আসে গলায়। আমি আর কতদিন অপেক্ষা করে থাকব?

কতদিন আর। চাকরি পেলেই। চাকরি পেলেই তুমি আমি ঘর বাঁধব। আমরা রাতারাতি সুখী হয়ে যাব, তোমার আবার ভাবনা? বাবা আমার কবিশিরোমণি।

উর্বশী চোখ নামায়। শাড়ির আঁচলে উর্বশী আঙুল জড়াতে জড়াতে বলে, কিন্তু মুখে যে আমার ব্রণ, মাথায় যে আমার চুল নেই?

তাতে কি? হৃদয়চাঁদ কাছে টানে। বাবা আমার কবিরাজ।

আঙুল কটা নিজের মুঠোয় শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে, চুল নিয়ে কি আমি পেতে শোব? আর ব্রণ? হুঁ, বিয়ে একবার হোক না, রাতা-রাতি ফর্সা। হৃদয়চাঁদ আঙুলে চাপ দেয়। আমার দরকার মানুষটাকে। আর সবের দিক থেকে তুমি তো কোনো ঘাটতি নও। বরং বেশীই আছে তোমার। ওজনে একটু ভারী জিনিস কে না পছন্দ করে।

লুটোনো আঁচল বুকে তোলে উর্বশী। তারপর ব্রীড়ানম্র গলায় অস্পষ্ট বলে, তুমি ভীষণ দুষ্টু।

হৃদয়চাঁদ বলে, কেশুত্তে পাতার দেড় চামচ রসের সঙ্গে তিন চামচ বিড়ালাক্ষী মূল চূণ। ব্যস! তাতে দেড় রতি কর্পূর মিশিয়ে মাথায় মুখে মেখে যাও। এ হল ভেষকাচার্য কবিশিরোমণি বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মোক্ষম বিধি। পঞ্জিকার গ্যাজা বিজ্ঞাপন নয়।

উর্বশী আরো কাছে সরে আসে। নিজের মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, তুমি কত ভাল।

ধ্যেৎ, ভাল না ছাই। যদি এত ভালই তোমার চোখে তবে তুমি কথা দিচ্ছ না কেন? হৃদয়চাঁদ অভিমান আনে গলায় তুমি আমায় ল্যাজে খেলাচ্ছ। তুমি নিষ্ঠুর।

বিকেলের আলো মুছে যাচ্ছিল। গাছের পাতার ওপর থেকে শেষ রং মরে গেলে সন্ধ্যা নামল। গড়ের মাঠের ঘাস আর দেখা যাচ্ছিল না। গঙ্গার দিক থেকে এক ঝাঁক হাওয়া এসে ওদের গায়ে লাগলো, উর্বশী আবার কথা বলল, বিড়ালাক্ষীর মূল আর কেশুত্তে পাতা পাব কি করে?

দু আঙুলে একটা ঘাস ছিঁড়েছিল হৃদয়চাঁদ। সেটা ফেলে দিয়ে জোর গলায় বলল, কলকাতায় কী না পাওয়া যায় বলত? বাঘের কেশর থেকে সিংহের ডোরাকাটা চামড়া পর্যন্ত। ইতিহাস খুলে দেখ,

লকাতার কতজন মস্ত ব্যবসায়ী জল পায়রার ডিম দিয়ে সিদ্ধি খেত। ামরে জোর হয়। এতে লড়াই করার ক্ষমতা বাড়ত না তাদের ?

কেন ?

সারাদিন গদিতে বসে থাকতে হয়ত। খদ্দেরদের সঙ্গে বচসা করতে য়ত ? তাই।

উর্বশী তাকিয়েছিল এসপ্লানেডের দিকে। সারি সারি আলোর বিন্দু। নয়নের আলো। ট্রাম বাসের শব্দ ঈষৎ কখনো কখনো কানে আসছিল। র্বশী বলল, তুমি আমাকে নিয়ে যে পালিয়ে যাবে বলেছিলে ?

বলেছিলাম। কিন্তু এখন এমারজেনসি। ভয় হয়। কোথায় কী য়ে পড়ে। যদি ফটক হয়ে যায়, কমসে কম ছ' মাসের ?

বাপস্। বেশ লম্বা করে ওই শব্দটা উচ্চারণ করে উর্বশী। তুমি জেলে গেলে আমি আত্মহত্যা করব।

তবে ? আমার আত্মার বুঝি কষ্ট হবে না ? তারপর আর একটু াছে সরে এসে বলে, কিছুই করবে না তুমি। আমি গেলে তুমি বাঁচো। রং ভাববে, আপদ গেছে ভালই হল।

উর্বশী গুনগুন করে কী সব কথা বলল, ঠিক শোনা গেল না। গালা-াল করল, না অভিমানের ভাষা আওড়াল ঠিক বুঝতে না পেরে হৃদয়-াদ বলল, তুমি দেখো, ঠিক আমি জোগাড় করে আনব। ভারি তো ড়ালাক্ষী আর কেশুত্তে পাতা। দেড় চামচ কেন, ডেইলি এক পিপে রে তোমায় সাপ্লাই দিতে পারব। তুমি শুধু মেখে যাও, ব্রণ ফরসা, ল আমি উঠিয়ে ছাড়ব।

উর্বশী বলল, তুমি আমার জন্য কত কর। তুমি আমাকে কত ালবাস। তুমি বোধ হয় পূর্বজন্মেও আমার কেউ ছিলে। এ জন্মে আমার ইস্টদেবতা।

তুমি আর বুঝলে কই ? হৃদয়চাঁদ এবার নাকি সুরে কথা কটা উচ্চার করল। আমি তোমার জন্য জীবন দিতে পারি। ভারি তো এমারজেনসি

এই না। উর্বশী যেন ধমকালো। ভীষণ তুমি অবাধ্য হচ্ছ দি দিন। উর্বশী যেন শাসন করল। মৃদু ভৎর্সনা করল, তোমার জীবনে দাম তুমি না বুঝতে পার, আমি তো বুঝি ?

হৃদয়চাঁদ এবার অনেকক্ষণ চুপচাপ করে থাকল। তারপর বলল ব্যাগে তোমার পয়সা নেই ? ঝালমুড়ি আসছে খাওয়াও না ?

ভারি তো ঝালমুড়ি। উর্বশী ব্যাগে হাত দাঁ দিয়ে আরো কাছে সরে এল। আর কী খাবে বল না ?

সব আমার কাছে তেতো। মুখটা কেমন বিস্বাদ হয়ে আছে যতদিন না তোমাকে পাচ্ছি বউ করে ঘরে তুলতে পারছি, ততদি আমার লিভার ভাল হবে না। পিত্ত কুপিত বলেই জিভ তেতো। বো না ? তাই একটু ঝালমুড়ির কথা সাময়িকভাবে বলছিলাম।

উর্বশী ডাকল, এই মুড়ি। এই ঝালমুড়ি।

ঝুড়ি মাথায় নিয়ে গড়ের মাঠ ঘুরে বেড়াচ্ছিল লোকটা। যেখানে জোড়া জোড়া বসে আছে তাদের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাস করছিল, দিদি ঝালমুড়ি ? রসে ভিজিয়ে উচ্চারণ করছিল লোকটা একেবারে ঘানিভাঙা খাঁটি তেল, আদা পিঁয়াজ পরখ করুন, নক নয়। কচি শশা, বিচি নেই।

লোকটা কাছে আসতে হৃদয়চাঁদ বলল, লাগাও।

লোকটা কিছু বলল না। কিছু জিজ্ঞাসাও করল না। একট গোল কৌটোর ভেতর কিছু মুড়ি তুলল, কিছু মশলা মেশাল, আদা শসার কুচি, নারকেলের টুকরো, ছোলা গোটা দশেক, তারপর চাম দিয়ে জম্পেস করে নাড়তে থাকল।

হৃদয়চাঁদ উর্বশীকে দেখছিল। উর্বশী বড় মাথা হেঁট করে বসে আছে। হৃদয়চাঁদ ডাকল, এই, ধরো।

লোকটা একটা ঠোঙা উর্বশীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, ঝাল কিন্তু ঝারিগোছের। আপনার ?

হৃদয়চাঁদ বলল, না না, বেশী ঝাল ভাল নয়। লিভার কুপিত। মুড়িটুড়িতে অত নয়, মেয়েছেলেটেলে সামনে থাকলে সময় অসময়ে ভেতর থেকে ওটা টিংটিং করে। যা খাব দুজনে এক খাব। ঠিক আছে।

লোকটা বলল, এক টাকা চার আনা।

উর্বশী ডান হাতে মুড়ির ঠোঙা ধরে বাঁ হাত দিয়ে ব্যাগটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, পয়সাটা দিয়ে দাও।

হৃদয়চাঁদ ও কথার জবাব না দিয়ে বলল, বাঃ! খাসা বানিয়েছো তো ? আলু আছে ?

আছে।

লাগাও।

লোকটা আর অপেক্ষা করল না। দুটো ঘুঘুর ডিমের মত সেদ্ধ আলু নিয়ে আঙুলের চাপ দিয়ে ভাঙলো, ভেঙে বলল, ঝাল নুন চড়া হবে ?

হোক। মুড়ি ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে হৃদয়চাঁদের। উর্বশী ততক্ষণে চিবোচ্ছে। হৃদয়চাঁদ বলল, দিদিমণিকে একটু তেল দাও বেশী।

উর্বশী বলল, কত হল ?

লোকটা বোধ হয় হিসেব গুলিয়ে ফেলেছিল। একটু ইতস্তত করে বলল, আড়াই টাকা। বেশী নয়।

মোটে ? হৃদয়চাঁদ দিদিমণির ব্যাগ থেকে পয়সা দিয়ে বলল, চ দেখলে পাঠিয়ে দিও তো। ঝুড়ি মাথায় তুলে পয়সা না গুনেই পকেটে ফেলে দিল লোকটা।

লোকটা চলে গেলে হৃদয়চাঁদ বলল, সত্যি, তুমি আছ তাই রক্ষে নইলে জীবনটা আমার মরুভূমি হয়ে যেত। কবে বোধ হয় সন্ন্যাসী হয়ে হরিদ্বারের দিকে চলে যেতাম।

এই না। উর্বশী যেন ধমক দিল। মাথার ওসব দুষ্টুবুদ্ধি এনে না। তুমি সন্ন্যাসী হলে আমার কী হবে ? উর্বশী আলুকাবলির শেষ ঢোক গিলে ফেলে বলল, এই তো সবে শুরু জীবনের। জীবন তো নদীর মত। সবটাই তো সামনে পড়ে আছে।

এতক্ষণ পরে বেশ আরাম করে একটা সিগারেট ধরাল হৃদয়চাঁদ ধরিয়ে বলল, একটু চা হলে মন্দ হত না। ভাঁড়ের চা-এ আদা থাকে। আদা রক্ত শুদ্ধিকারক। মাথা ঠাণ্ডা রাখে। টিংটিং ভাবটা বন্ধ করে।

চাগ্রম। ঠিক তক্ষুনি কোকিল কণ্ঠ কানের কাছে বেজে উঠল হৃদয়চাঁদ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আচ্ছাসে বানাও। হৃদয়চাঁদ একবার জিজ্ঞাসা করল, ভেলিগুড় না চিনি ?

চিনি।

দিদিমণিরটায় একটু কম দিও। বেশী চিনি খেলে মাথা ঘোরে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এখন দিদিমণির।

হিন্দুস্থানী চা-অলা অতশত বুঝল না। হৃদয়চাঁদ প্রায় ধমকের সুরে বলল, অতশত বুঝবি না, জীবন হল নদীর মত।

চা-অলা চা খাইয়ে চলে গেলে হৃদয়চাঁদ বলল, আর কতদিন গড়াবে, তার চেয়ে তোমার বাবাকে বল।

সেদিন ইচ্ছে করেই লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন তুলতে গেল হৃদয়চাঁদ। অন্যদিন চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করে। আমি গ্র্যাজুয়েট ছেলে রেশন আনব হাতে করে? কমসেকম তিরিশজনের পিছনে দাঁড়িয়ে উনত্রিশজনকে মুখখিস্তি শুনিয়ে যখন ক্যাশমেমোর কাছে এল, তখন রেশনকার্ড না দিয়ে বাড়িয়ে দিল প্রেমপত্র।

ক্যাশমেমো থেকে চোখ তুলে বিস্ফারিত তাকাল বলরাম।

হৃদয়চাঁদ মৃদু গলায় বলল, বলদা, তুমি মাইরি বিজ্ঞ। দয়ার সাগর। কত লোককে চাল গম দাও। বিদ্যাসাগর। আমাকে একটু দয়া কর। একটু তর্জমা করে দাও সাত নম্বর লাইনটার। সাড়ে চোয়াত্তর দিব্যি মাইরি, বোল না কারোকে।

বলরাম বলল, এতে পাংচুয়েশানের অভাব।

মানে?

কমা, ফুলস্টপের অভাব। তা শোন হৃদয়চাঁদ।

বল!

সন্ধ্যেয় আয়।

তখন পারবে?

নিয়ে যাব।

কোথায়?

দর্জির দোকানে।

প্রেমপত্র পকেটে নিয়ে সন্ধ্যায় এল হৃদয়চাঁদ। বলরাম নিয়ে গেল এক দর্জির দোকানে, 'দি নিউ ভারতমাতা ওরিয়েন্ট আর্ট টেলারিং শপ'। দোকানের মালিক ভদ্রলোক চিঠিটা দেখে একটা উদগার তুললেন। তুলে সুপারিশ করে দিলেন পাশের 'ডাইং ক্লিন'-এ। এর মালিক গম্ভীর। চুলদাড়ি ঈষৎ পাকা। ক্যাশমেমোর ওপর অনর্গল

ইংরেজীতে কথা লিখতে হয়—টেরিন, টেরিকটন, টেরিভয়েল ইত্যাদি আর্জেণ্ট, সেমি-আর্জেণ্ট, অর্ডিনারি ইত্যাদি। ভদ্রলোক বললেন একটু বোসো। মাল ডেলিভারি নিতে আসবেন একজন দিদিমণি করিয়ে দেব।

ভদ্রমহিলা এলেন! হৃদয়চাঁদের পয়সায় ঘুষ দিলেন এক কাপ চা। দিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না দিদিমণি। আপনার অধ্যাপিকা। সমাজের কুলগৌরব। চাঁদের আলো। আমার ভাগে মামার কাছে এসেছে অনেক আশা নিয়ে। একটু উপকার করতে হবে।

কি।

তর্জমা।

কিসের?

প্রেমপত্রের। হৃদয়চাঁদকে দেখিয়ে বললেন, আমার এই ভাগ্নে হৃদয়চাঁদের।

কিন্তু অধ্যাপিকা ভদ্রমহিলা হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন শাড়ির আঁচল ছিঁড়েছে বলে। তার ওপর আবার এই পীড়ন। প্রেমপত্র। গলার শিরা ফুলিয়ে বললেন, ইউ, জি. সি নতুন আইনে পরীক্ষার খাতা দেখার ফি দেবে না বলেছে, কিন্তু প্রেমপত্রের জন্য পয়সা নিতে না করেনি। শব্দ পিছু ষাট পয়সা এ এবং দি-র জন্য পাঁচ নয়া করে ছাড়।

তাই। হৃদয়চাঁদ রাজী হল? চাঁদের আলো তর্জমা করে দিয়ে গটমট করে চলে গেলেন—'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়'।

বলরাম বলল, তোকে গরু বলেছে হৃদয়চাঁদ।

হৃদয়চাঁদ চুপ।

তুই গ্র্যাজুয়েট বেকার, এতদিনেও তুই একটা চাকরি জোটাতে পারলি না। তাই তোকে ঘাটের মড়া না বলে ঘরপোড়া বলেছে।

হৃদয়চাঁদ তাতেও চুপ।

ডাইং ক্লিনের ভদ্রলোক বললেন, মাইয়াটার ঠ্যায়ার আছে।

বলরাম খুব গম্ভীর গলায় বলল, মেয়েটার গায়ের রং তোর মত, না ফর্সা?

ফর্সা। হৃদয়চাঁদ এতক্ষণ পরে কথা বলল।

তাই নিজেকে সিঁদূরে-মেঘ বলেছে। বলরাম কপাল কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, তুই মেয়েটাকে ভয় পাস?

না তো।

প্রেমপত্র তাই তো বলছে। ডরাস।

হৃদয়চাঁদ আর দাঁড়ায় নি। রাগে ফুলতে ফুলতে একটা রিকশা চেপে বাড়িতে ফিরে এল। রিকশার ভাড়া নিয়ে ঝগড়া করল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, জেনানা আদমিকো জীবনে বিশবাস মাত করো। এইসা সুন্দরী লেড়কিকোদের হাম এ করি।

ষষ্ঠ প্রেমিকা নম্র, ধীরস্থির, লাবণ্য আছে। হৃদয়চাঁদের কথাবার্তায় পটে গেল। কিন্তু কথাবার্তা পাকা হবার মুখে সব কেঁচে গেল। মেয়েটি নাকি বেজায় শিবের ভক্ত। মাছ মাংস স্পর্শ করে না। অমাবস্যা পূর্ণিমায় উপবাস করে। খনার বচন কথায় কথায়। বার ব্রত পালন করে। কম্বল পেতে ক্রিয়া করে।

ক্রিয়া কি? হৃদয়চাঁদ একদিন জিজ্ঞাসা করল।

প্রাণায়াম। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাবার একটা গুপ্ত কৌশল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অনেক ব্যাপার আছে। সোজা কথায় বলতে পার যোগসাধনা।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হৃদয়চাঁদ ভাবল। ভেবে ভেবে একটা ঘটনা তার মনে পড়ল। পাড়ার চক্কোত্তি গিন্নীর এক অষ্টাদশী মেয়ে ছিল নাম দুর্গা। বাড়ির মুখেই শিবমন্দির। নামডাক বেশ। পাড়া-বেপাড়া অনেক কুমারী মেয়ে শিবরাত্রিতে ঘটি ঘটি জল ঢেলে যায় শিবলিঙ্গে। রোজ রাত্তিরে দুর্গা মন্দিরে যায় আর মাঝরাত্তির পার হলে ফিরে আসে। একদিন চক্কোত্তিমশাই গিন্নীকে শুধোলেন, দুর্গা কোথায়? গিন্নী বললেন, মন্দিরে।

চক্কোত্তিমশাই-এর আনন্দ আর ধরে না। জানো, গিন্নী, পাকা ভক্ত মেয়েটা। কি ধর্ম পরায়ণা, চক্কোত্তি বংশে দুর্গানাম সার্থক। ও মেয়ে বাঁচলে হয়। ওব কপালে চক্র আছে।

গিন্নী বললেন, একদিন শুনলাম, শিবের সঙ্গে কথা বলছে।

সে কি গো? আনন্দে আহ্লাদে আটখানা চক্কোত্তিমশাই। কপালে হাত ঠেকান। বাবা শিবশম্ভু আশীর্বাদ করো দুর্গাকে।

সেদিনই চক্কোত্তিমশাই মাঝরাত্তিরে দরজায় কান পাতলেন। সত্যিই তো দুর্গা কথা বলছে। চক্কোত্তিমশাই শিবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দরজা ঠেললেন। আর ঠেলেই অবাক। সন্ধ্যারতির পর—শিবলিঙ্গ যেমন বিল্বপত্রে ঢাকা তেমনি আছে। পাড়ার শিবপদ দুর্গাকে বক্ষে ধারণ করে কষে আদর করছে।

সাত-পাঁচ ভেবে হৃদয়চাঁদ খরচের খাতায় টুকে রাখল তার ষষ্ঠ প্রেমিকাকে। এখন উর্বশী তার সপ্তম প্রেমিকা।

হৃদয়চাঁদ এখন বলল, তুমি কিন্তু কিচ্ছুটি ভেব না উর্বশী। মুখের ব্রণ কর্পূরের মত উবে যাবে আমার কৃপায়। আর চুল? কালই যাব চিৎপুরে।

হাঁটতে হাঁটতে উর্বশী নববধূর মত চোখ করে তাকাল। সোহাগের

ুরে হৃদয়চাঁদ বলল, কাল দুটো সিনেমার টিকেট কেটো ম্যাটিনিতে। চিৎপুর থেকে ঠিক সময়ে এসে যাব।

আনন্দে গদগদ উর্বশী সগর্বে ঘাড়ের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে গুনগুন ের বলল, হৃদয়, তুমি আমার হৃদয়, আমার রাম, আমার কৃষ্ণও।

হৃদয়চাঁদ ওর আঙুল ছুঁয়ে বলল, সিনেমার শেষে কষামাংস আর মোগলাই পরটা খেতে আমার খুব ভাল লাগে।

খাওয়াব।

হৃদয়চাঁদ মাথার দিকে তাকিয়ে থেকে সোহাগ মাখিয়ে উচ্চারণ করল, উর্বশী, তুমি আমার প্রেমের বাগানে সাতরঙের প্রজাপতি। তুমি পাশে থাকলে রামকৃষ্ণের অমৃতবাণী বড় মনে পড়ে—টাকা মাটি, মাটি টাকা।

বাস এসে গিয়েছিল। ওঠার মুখে হৃদয়চাঁদ বলল, তুমি কিচ্ছুটি ভেব না উর্বশী. চুল আমি উঠিয়ে ছাড়ব। ব্রণ আমি নির্মূল করব। বাসের টিকিটটা কেটো।

'দুই পিতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যা

'ট্যাং' করে ঘড়িতে একটা শব্দ হল। রাত সাড়ে দশটা। ঘড়ি অনেক কালের প্রাচীন। পরমেশ্বরের গোঁফ জোড়ার মতই পুরোনো সস্তা জাপানী ওয়াল ক্লক। মেজাজ অনেকটা পরমেশ্বরের মত। কো ভনিতা না করেই হুম করে সময় ঘোষণা করে। পরমেশ্বরের সব কিছু প্রাচীন। এখন যে আমকাঠের তক্তাপোশের উপর বসে বসে চুমু দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে এক গেলাস দুধ খাচ্ছেন, সেটার বয়স কম হ না। ইচ্ছে করলেই একটা ভালো খাট কিনতে পারতেন, কেনেন নি টাকাটা ব্যাঙ্কে সুদে বাড়ছে। ঘুমটাই বড় কথা, খাটটা বড় নয় বিছানাটাও একটা অদ্ভুত সমন্বয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কণ্ট্রোলে কেনা-মিলিসিয়ার খোলের মধ্যে শিমুল আর কাপাস তুলো ঠেসে ঢোকানো। চাদর একটা বড় বহরের মার্কিন। মশারি এক সম সাদা ছিল, এখন ধূসর। বেশি টানাটানি সহ্য হবে না বলে ঝলম করে ঝুলছে! একটা পাশ গোটানো, সেই অংশে পরমেশ্বর ব আছেন। হাতে ধরা গেলাস। গেলাসে সরওলা গরুর দুধ

গ্লাসটাও বহুকালের। পরমেশ্বরের হাতে সব কিছুরই পরমায়ু বেড়ে
যায়। এমন কি নিজের জীবনেরও। পরমেশ্বরের সঙ্গে যাঁরা জীবন
শুরু করেছিলেন তাঁদের অনেকেই আবার নতুন জন্ম পেয়েছেন।

ঘড়ির শব্দের কোন ঝঙ্কার নেই। একটা ভারি ধাতব শব্দ।
পরমেশ্বর চোখ তুলে তাকালেন। গোঁফের উপর একটু সর জড়িয়ে
আছে। —বড্ড দেরি হচ্ছে। কথাটা বললেন একটু দূরে টুলের
পর বসে থাকা ছেলেকে লক্ষ্য করে। ছেলের নাম বঙ্কিম। বঙ্কিম
অপরাধীর মত মুখ করে বসে রইল, বাবার গোঁফের উপর লেগে থাকা
সরের দিকে তাকিয়ে। সে জানে সবটা মুখের যাওয়া-আসার পথের
পর এমন একটা অনুভূতিহীন অংশে পাশ কাটিয়ে সরে গেছে,
পরমেশ্বরকে না বলে দিলে সরের অংশটা ওইখানেই সারারাত নিরাপদে
থেকে যাবে। পরমেশ্বরের মতে সরই হল দুধের সারাংশ। যেদিন
দুধে সর পড়ে না, সেদিন তিনি বাড়িতে কোর্ট বসিয়ে ফেলেন। সর
কোথায় সরে গেল না জানা পর্যন্ত নিস্তার নেই।

বঙ্কিম আজ অপরাধী। অপরাধীর, কথা বলা উচিত নয়, তা না
হলে সে গোঁফের উপর সরের কথাটা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে
পারত। বঙ্কিমের অপরাধের সীমা নেই। প্রথম অপরাধ, সে প্রেম
করে বিয়ে করেছে। হাফ প্রেম, হাফ সম্বন্ধ। পরমেশ্বরেরই এক
ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে। প্রেমটা যখন প্রায় বিপজ্জনক সীমায় এসে ঠেকেছে
তখনই সে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়েছে পরমেশ্বরকে। প্রথমে খেলছিল তারা
দুজনে, সেকেণ্ড হাফ খেললেন পরমেশ্বর আর পরমেশ্বরের বাল্যবন্ধু।
তখন নায়ক নায়িকারা গ্যালারীর রুদ্ধশ্বাস দর্শক। গোল হতে হতে
না। শেষে পরমেশ্বরের বন্ধু জালে বল জড়িয়ে দিয়ে, ঝাড়া হাত-
হয়ে বিদেশ চলে গেলেন।

বঙ্কিমের উপর পরমেশ্বরের সেই থেকে রাগ। মূর্খ ছেলে। করলি করলি তা বলে এইভাবে! পাওনা গণ্ডা নিয়ে একটু কষাকষির স্কোপ রাখলি না। উল্টে বউভাতে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্‌ পড়ে গেল। নেহাত সবেধন নীলমণি। পরমেশ্বর ব্যাপ মেনে নিলেন।

দ্বিতীয় অপরাধ, পরমেশ্বর ছেলেকে সোজাসুজি বলেছিলে দ্যাখো বিয়ে করেছো করেছো, তোমার ইনকাম তেমন ভাল নয়, এ যেন সন্তান-সন্ততি না হয়। ছেলেপুলে না বলে শুদ্ধ ভাষা বলে পরমেশ্বরের এইটাই বৈশিষ্ট্য। রেগে গেলে বলেন, ব্লাডি বা বঙ্কিমের শ্বশুরমশাই বিয়েটা খুব কম খরচেই সেরেছিলেন। হাতঘড়ি, পাঞ্জাবি-ধুতি, একজোড়া জুতো, কয়েক ভরি সোনা, হা খানেক টাকা নগদ। একটা বিছানা। খাট দেন নি। কারণ ব কোন এক জামাই খাটে বসে ফুলশয্যার রাতে হুঁকো খেতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন, সেই অপরাধে বঙ্কিমের বরাতে খাট জোটে পরমেশ্বরই ছেলে-বউকে একটা কায়দার খাট কিনে দিয়েছিে পরমেশ্বর ভেবেছিলেন, খাটের শাসনে প্রথম বিয়ের উচ্ছাস ঠাণ্ড যাবে। হয়েছিলও তাই। বউয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে কি, সারা শবাসনে শুয়ে থাকত। পাশ ফেরারও উপায় ছিল না। কিন্তু বয় এমন দোষ বছর না ঘুরতেই বঙ্কিম ফাদার হতে চলেছে। এই রাত। ফাদারের সামনে টুলে বসে আছে অপরাধীর মত মুখ ক বউ নার্সিং হোমে। খবর আসবে শ্যালকের সাইকেলে। রাত স দশটা হয়ে গেল। এখনও কোন খবর নেই।

তৃতীয় অপরাধ বঙ্কিমের নয়, বঙ্কিমের বউয়ের। দশটার স পরমেশ্বর শুয়ে পড়েন। পরমেশ্বরের নিয়মের রাজত্ব আর

ামেশ্বরের চেয়ে কম যায় না। তাঁর নিয়মেব ঠেলায় স্ত্রী অনেক
াগেই চলে গেছেন। বঙ্কিমের ওপরে একটি বোন ছিল, সেও সরে
ড়েছে। কেবল বঙ্কিমই আটকা পড়ে গেছে। তাকে খাওয়াদাওয়ার
ব ঘরের মধ্যে গুনে গুনে একশো বার পায়চারি করতে হবে। প্রথম
তে বাঁ পাশে কাত হয়ে শুতে হবে। মধ্যরাতে চিৎ। শেষ রাতে
নপাশ। সকালে খালি পেটে এক গেলাস জল। চায়ে চুমুক
বার সময় শব্দ হবে না, খেতে খেতে চক চক শব্দ করা চলবে না।
ারে হাসা চলবে না, হাসলেও দাঁত দেখা যাবে না। বউয়ের শাড়ির
না থেকে সায়া বেরোবে না। চলার সময় পায়ের শব্দ শোনা যাবে
। গুন গুন করে গান চলবে না সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার ঘন ঘন
, মাঝে-মধ্যে একটা। খাবাব পর শব্দ কবে ঢেকুর নট অ্যালাউড।
ই পরমেশ্বর আজ পৌনে এগারটার সময়েও শুতে যান নি, কারণ
ঙ্কম, কারণ বঙ্কিমের বউ। বঙ্কিমের বউ কেন এত দেরি করছে।
ন দশটার আগেই সে একটি প্রাণকে পৃথিবীতে আনতে পারছে না।
ঙ্কমের মনে হল প্রসবের দায়িত্বটা যদি তার হাতে থাকত তা হলে
টার আগেই সে কাজটি সমাধা করে তার বাবাকে সন্তুষ্ট করার শেষ
ষ্টা করে দেখত। বঙ্কিমেব মনে হল, পরমেশ্বর মনে মনে বলছেন—
পদার্থ।

পরমেশ্বর শুয়ে পড়ছেন না কেন? মনের দিক থেকে সময় সময়
নি দুর্বল। যতই হোক পুত্রবধূ। যদিও বাক্যালাপ অনেক দিন
। বউ হয়ে আসার সাত দিনের মাথাতেই শ্বশুর আর পুত্রবধূতে
। দেখাদেখি বন্ধ। পরমেশ্বর অবশ্য বিয়ের রাতেই তাঁর এক
ত্মীয়কে বলেছিলেন—এইবার আমাকে একটু রাশ টানতে হবে।
টু কড়া হতে হবে। তা না হলে ডিসিপ্লিন বজায় রাখা যাবে না।

বঙ্কিম বিয়ের পিঁড়েতে বসে কথাটা শুনে ফেলেছিল। একে তার পে
হারিয়ে গেছে তার উপর বাবার সামনে বিয়ের আসরে বসার ল
সেই সময় তার বাবার ভবিষ্যত চেহারা, সব মিলিয়ে এক মর্মা
পরিস্থিতি। বঙ্কিম সেই ছেলেবেলা থেকেই বাবার ভয়ে কাত
বন্ধুরা বলত, বাবাতঙ্ক। এর কোন চিকিৎসা নেই।

বঙ্কিমের ধারণা অসহযোগ আর বয়কট পরমেশ্বরের হাত থে
মহাত্মা গান্ধীব হাতে গিয়েছিল। পরমেশ্বর তাঁর বিচিত্র সংসারে
অস্ত্র দুটিকে শানিয়ে, এর ধার পরীক্ষা করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়ো
জন্য গান্ধীজীর হাতে যেন তুলে দিয়েছিলেন। মারধোর নয়, রাগার
নয় মুখের উপর একটা ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্যের মুখোশ টেনে সংসারের স
মানুষকে তটস্থ করে একেবারে মৌনী হয়ে গুমোট আকাশের মত দি
পর দিন বসে থাক। বুঝিয়ে দাও পরমেশ্বর অখুশী। এই
অপরাধীর মুখোমুখি হলেই একটা অদ্ভুত নাচের ভঙ্গী করে পরমে
একপাশে সরে যেতেন। পচা মৃতদেহ কিংবা সকালে মেথরের মা
বিষ্ঠা দেখলে মানুষের যে প্রতিক্রিয়া হয় সেই রকম একটা ভাব ব
তিনি ঘৃণার মাত্রাটা অপরাধীকে বুঝিয়ে দিতেন। বঙ্কিমের বরা
এই ধরনের ব্যবহার যে কতবার জুটেছে! শেষ জুটেছে বি
ঠিক আগে।

বঙ্কিম ঠিক প্রেম বা বিয়ে কোনটার জন্যেই প্রস্তুত ছিল
বঙ্কিমের মা মারা যাবার পর পরমেশ্বরই তার জীবনশিল্পী হতে চে
ছিলেন। যখন যে ভাবটা পেয়ে বসত সেইভাবেই বঙ্কিমকে চাল

তেন। নিজে ছিলেন বৃটিশ আমলের সরকারী অফিসার। ইংরেজি
তে অজ্ঞান। কথায় কথায় বলতেন—সাহেবের জাত, ওরা সব
বতা। আবার চৈতন্যচরিতামৃত পড়তেন, বিবেকানন্দ পড়ে আবৃত্তি
রতেন, ঊর্ধ্বরেতা হবার ব্যাপারটা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আবার স্যার
রেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার কথা প্রায়ই বলতেন। বঙ্কিমের ভবিষ্যত
বিনের রূপকার হতে চেয়েছিলেন পরমেশ্বর অথচ সেই ভবিষ্যত
ম্পর্কে তাঁর কোন সম্যক ধারণা ছিল না। আকাশে মেঘ আর রোদের
লার মত বড় বড় জীবন আর ভাবের প্রভাবে তিনি অনবরতই
াণ্ডুলামের মত দুলতেন। ছেলের নাম রেখেছিলেন বঙ্কিম, কারণ যে
র্ণিমার বিকেলে তাদের পুরোনো বাড়ির স্যাঁতসেঁতে আঁতুড়ে ভূমিষ্ঠ
য়ছিল সেই বিকেলে পরমেশ্বর বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পড়ছিলেন। আর
ঙ্কিমের মত এক মহাপুরুষের জন্ম দিয়ে তার ক্ষীণজীবী মা যন্ত্রণায়
ছটফট করছিলেন এবং সেই বিকেলেই সূতিকার জীবাণু জন্মনাড়ীতে
ড়িয়ে নিয়ে মহাপুরুষের তিন বছর বয়সেই পরমেশ্বরের মত ডাকসাইটে
তার হাতে ছেলেকে জিম্মা করে দিয়ে সরে পড়েছিলেন। পরমেশ্বর
ঙ্কিমের বিয়ের কয়েক বছর আগে ছেলেকে এক মহান ত্যাগী সন্ন্যাসীর
হারায় দেখতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম কিন্তু তখন অন্য এক্সপেরিমেন্টে
স্ত। সে তখন নিজেকে জিতেন্দ্রিয় অবতার ভাবতে শুরু করছিল।
লেদের সঙ্গে যেভাবে সহজে মেশা চলে সেইভাবে মেয়েদের সঙ্গে
লামেশার পরীক্ষা চালাচ্ছিল। সবে অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়ে মনে মনে
াওড়াতে শুরু করেছে—স্ত্রীয়া সমস্তা সকলা জগৎসু। মেয়েরা সব
য়ের মত। 'মানুষ' বলে প্রচণ্ড একটা দার্শনিক প্রবন্ধ লিখে কোন
ক ধর্ম পত্রিকার সন্ন্যাসী সম্পাদককে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

এই পরীক্ষার মুখে বঙ্কিমের পিতৃবন্ধু সপরিবারে বিদেশ থেকে ফিরে

বাইরে চলে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় বঙ্কিম তার পিতৃবন্ধুর মেয়ে
সঙ্গে খেলা করত। সেই সময়কার তোলা একটা গ্রুপ ফটোতে দুটি
পরিবারকে দেখা যায়। বঙ্কিম একেবারে সামনের সারিতে বসে বসে
আঙুল চুষছে আর পিছনে চেয়ারে বসে আছেন বঙ্কিমের শাশুড়ী
কোলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তার বউ একটা চোখ একটু বোজানো
জিভটা বেরিয়ে আছে সামনে, বোধ হয় ক্যামেরাম্যানকে ভেংচি
কাটছিল। দীর্ঘ পনের বছর পরে বাল্য সঙ্গীর সঙ্গে যখন দেখা হল
তখন সে বড় সড় একেবারে জেণ্টল লেডি। 'বঙ্কিম হল বঙ্কিমদা
বঙ্কিমের বাবা কাকাবাবু। দীর্ঘকাল বাইরে থাকার ফলে জড়তা ঝরে
গেছে। শালোয়ার কামিজ পরে। সাইকেল চালায়। বাংলার মধ্যে
হিন্দির মিশেলঃ যেমন টক নয় খাট্টা, মিষ্টি নয় পিনো, ভাল নয়
বড়িয়া, মাসি নয় মৌসি, বিড়াল নয় বিল্লি। বঙ্কিমও তখন সেই ছেলে
বেলার আঙুল চোষা বাঁদর নয়, বেশ চোখা যুবক, একমাথা ঘন কালো
কোঁচকানো চুল ঘাড়ের কাছে ঢেউ ভাঙা, চোখ দুটো ভাসা ভাসা বড়ই
ছিল, ত্রাটক সাধনার ফলে সেই চোখের দৃষ্টি তখন আরো তীক্ষ্ণ
ডিমে তা দেবার সময় পাখির চোখের দৃষ্টির মতো উদাস ফ্যালফেলে
তার উপর সোনালী ফ্রেমের শিল্পী চশমা, নাকটা বেশ খাড়া। ভদ্রমহিলা
এই বাঙালী যুবকটির তীক্ষ্ণ চেহারায় যেন প্রথম থেকেই একটু মজে
গেলেন। বঙ্কিমের কিন্তু অন্য ব্যাপার, তার তো তখন নতুন একস
পেরিমেণ্ট চলেছে। ইন্দ্রিয়কে যে জয় করে ফেলেছে তার কাছে
ছেলে আর মেয়ের তফাৎ কোথায়!

আর ঠিক সেই সময় পরমেশ্বর একটা নাটক করার অদ্ভুত সুযোগ
পেয়ে গেলেন। আবার সেই বয়কট। বঙ্কিম বসে বসে বই

ধন কার জানালার গরাদ ধরে হেসে ওঠেন বলতে পারে না।
রমেশ্বর কদিন ধরেই একটু গুমোট ছিলেন। ব্যাপারটা ঠিক কি
াঝা যাচ্ছিল না। মনের এইরকম একটা গুমোট অবস্থায় পরমেশ্বর
াল বিকেল গঙ্গার ধারে বেড়াতে চলে যান। বাড়িতে যতক্ষণ
াকেন ঢুমঢুম করে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে হাঁটেন। মার্কিনের লুঙ্গি
কের উপর তুলে বাঁধেন। আর মাঝে মাঝে বিকট গলায় তারা তারা
লে চিংকার করেন। সেই চিৎকারে রাস্তার ছাড়া কুকুর চমকে উঠে
ানলার দিকে মুখ তুলে এক ভলক ঘেউ ঘেউ শব্দ ছাড়ে। পরমেশ্বর
থাবীতি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্কিম পড়ছিল, এমন সময় বঙ্কিমের
উ এসে হাজির। পড়া ভণ্ডুল হয়ে গেল। বঙ্কিমদার সঙ্গে বেড়াতে
াবে। দূরে কোথাও নয়, গঙ্গাব ধারে। আহা কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে!

বঙ্কিম বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গঙ্গার ধারে দু'জনে হাত
বাধরি করে চলেছে, হঠাৎ উল্টো দিক থেকে পরমেশ্বর এসে পড়লেন।
বঙ্কিম ডেসপ্যারেট। ছেলে আর মেয়েতে তার কাছে তখন কোন
তফাৎ নেই। হাতে হাত ধরাই রইল। পরমেশ্বর তির্যক দৃষ্টিতে
একবার তাকিয়েই গম্ভীর মুখে রাস্তার একপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।
আর সেই রাতেই তাঁর মনের আকাশ পুরোপুরি মেঘে ঢেকে গেল।
মাঝেমাঝে তারা তারা গর্জন। বঙ্কিমকে দেখলেই সেই নাচের ভঙ্গী
করে সরে যাওয়া। ডেলিকেট ফুট ওয়ার্ক। নিজের বোনকে ডেকে
বললেন, বলে দে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বংশের মুখে চুনকালি মাখাতে
হবে না। যা করার বিয়ের পর করুক। মোষ্ট আনবিকামিং অফ
আওয়ার ফ্যামিলি, ছি ছি ছি ছি, তারা তারা। পরমেশ্বরের বিধবা
বোন, বিধবা হবার পর থেকেই পরমেশ্বরের সংসার দেখাশোনা করেন।

ভদ্রমহিলা পরমেশ্বরের মেজাজ বোঝেন। পরমেশ্বর জল নিচু বললে তিনি নিচু বলেন, উঁচু বললে উঁচু। আনবিকামিং শব্দটা কিভাবে তাঁর কানে গেল কে জানে। তিনি বললেন, ডেকে আনবো ছোড়দা? পরমেশ্বর খেপে গেলেন—ডেকে আনবি, কাকে ডাকবি? ভগবানকে ডাক। সব ভেসে গেল। পরমেশ্বরের সারা জীবনটাই গেল গেল। সমাজ গেল, সংসার গেল ধর্ম গেল, কর্ম গেল। আসলে কিছুই যায়নি। যাবার মধ্যে তাঁর পরিবারের সকলে একে একে পরপারে চলে গেছেন। আর গেছে তাঁর মাথার চুল। ঘাড়ের কাছে চামরের মত এক থুপপি অবশিষ্ট আছে। পরমেশ্বর বললেন—পাঁজি আছে? আমি কালই বিয়ে দেব। এই ভলাপচুয়াস মহিলার সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়ানো! বোন বললেন—ভোল পালটাবে কেন, ওতো এখন শাড়িই পড়ছে ছোড়দা। পরমেশ্বর বললেন, গেটআউট। আসলে ভদ্রমহিলা ইংরেজী বোঝেন না। আর কথায় কথায় ঘুমিয়ে পড়েন। একদিন ভাতের হাঁড়ি থেকে ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা দেখার জন্যে হাতা ঢুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন. জেগেছিলেন ভাত পুড়ে চড়চড়ে হয়ে যাবার পর। আর একদিন একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় তিনতলার নেড়া ছাদ থেকে পড়তে পড়তে রক্ষা পেয়েছিলেন। পরমেশ্বরের গেট আউটে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল, বললেন চা করে আনব? এই সব উত্তেজনার মুহূর্তে পরমেশ্বর ঘন ঘন চা খেয়ে নার্ভ শক্ত রাখেন। পরমেশ্বর একটু নরম গলায় বললেন—একটু কড়া করে। পরমেশ্বরের ছায়ার মত এই বোন। বোন না থাকলে তাঁর এক মুহূর্তও চলে না।

বঙ্কিমের কানে যথাসময়ে কথাটা গেল। আর তখনই জেদের বসে সন্ন্যাসী বঙ্কিম প্রেমিক বঙ্কিম হয়ে গেল। বিয়ের কথা সে কোনদিন

ভাবেনি। সন্ন্যাসী হবারই তোড়জোড় করছিল। পরমেশ্বরের কেরামতির ফলে গেরুয়া ছেড়ে সিল্কের পাঞ্জাবি পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ল। পরমেশ্বরের তখনও অসহযোগ চলছে। সবই করছেন কিন্তু মুখ কালো। অন্য সময় হলে বঙ্কিম ভিরমি যেত। নিলডাউন হয়ে ক্ষমা চাইত। নেহাত নব বলে বলীয়ান বলে বঙ্কিম খাড়া ছিল। অনেকটা নেশার ঘোরেই পিঁড়িতে বসেছিল। বঙ্কিম তখনও জানত না তার বরাতে কি আছে। পরমেশ্বর বঙ্কিমকে লটকে দিয়ে খাঁচায় পোষা পাখি করে আস্তে আস্তে তার অবাধ্যতার প্রতিশোধ নেবার প্ল্যান করেছিলেন। বিয়ের পর পরমেশ্বর টেবিবল পরমেশ্বর হয়ে ছেলে-বউয়ের জীবনে নেমে এলেন। অসহযোগই তাঁর অস্ত্র।

বউভাতের দিন ঘোষণা করলেন, এটা কামজ বিবাহ। পরমেশ্বর গেঞ্জি গায়ে বেঞ্চিতে বসে বোনকে কথাটা বলেছিলেন, বোন দৌড়ে গিয়ে একটা কামিজ এনে দিলেন। পরমেশ্বর কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জামাটা পরে ফেললেন। বেয়াই হলেও বাল্যবন্ধু কিন্তু তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন, ভদ্রলোক খুব ঘাবড়ে গিয়ে মেয়েকে কানে কানে বললেন সাবধানে থাকিস, শত্রুপুরী। মেয়ে মুচকি হাসল। সে জানত দুর্গে যখন একবার ঢুকেছে তখন শত্রুপক্ষকে ছারখার করা শক্ত হবে না। বঙ্কিম বেচারা হাতে দুব্বো ঘাস বেঁধে ছাগলের মত ঘুরছে। পরমেশ্বর শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, যেসব পুরুষের ব্যক্তিত্ব নেই, ম্যাদামারা, তাদের বরাতে অনেক দুঃখ। আসলে পরমেশ্বর বঙ্কিমের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে পুত্রবধূকে একটু জব্দ করতে চেয়েছিলেন। অত সহজে বুকের ধন কেড়ে নিয়ে সুখে থাকবে তা হচ্ছে না। বঙ্কিম হামারা, তুমহারা নেই।

তিন দিনের দিন পরমেশ্বর আবিষ্কার করলেন, পুত্রবধূর শাড়ির তলা

দিয়ে সায়ার লেস বেরিয়ে আছে। বোনের হাত দিয়ে একটা কাঁচি পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, কেটে ছোট করতে বল। পুত্রবধূ কাঁচিটা সেলাইয়ের বাকসের মধ্যে পুরে রাখল, সায়ার লেস শাড়ির নীচে আরো এক ইঞ্চি বেশী ঝুলল। চতুর্থ দিনে পরমেশ্বরের মাথায় বঙ্কিমের বউয়ের ভিজে শাড়ির জল এক ফোঁটা পড়ল। পরমেশ্বর চান করে উঠোন দিয়ে আসছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার গঙ্গায় ফিরে গেলেন। ফিরে এসে আবার শাড়ির তলায় দাঁড়ালেন যদি আবার এক ফোঁটা পড়ে তাহলে আবার দুমদুম করে গঙ্গায় যাবেন। শাড়ি তখন শুকিয়ে এসেছে, দ্বিতীয় ফোঁটা না পড়ায় হতাশ হলেন। ওপরে উঠে এসে বোনকে বললেন—ব্রহ্ম-তালুতে একনাদা গোবর ঘুঁটে করে লাগিয়ে দে, যা জীবনে হয়নি তাই হলো, মেয়েদের শাড়ির জল মাথায় পড়ল, আমার পরমায়ু কমল।

বঙ্কিম স্ত্রীকে বলল—ছি ছি, শাড়ি একটু নিংড়ে দিতে পার না। বউ বলল, কাকাবাবুর কি দরকার ছিল কাপড়ের তলা দিয়ে যাবার। পঞ্চম দিনে বউ মাঝরাতে খিলখিল করে খাট দুলিয়ে হেসে উঠল, পরমেশ্বর সারা রাত দুমদুম করে ছাদে পায়চারি করলেন আর মাঝে মাঝে বুক কাঁপানো জয় মা, জয় মা ডাক ছেড়ে বুঝিয়ে দিলেন তিনি উত্তেজিত।

ষষ্ঠ দিনে বঙ্কিমের বউ সন্ধ্যেবেলা পরমেশ্বরের আহ্নিকের সময় রেডিওতে হিন্দি গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের ঘরে টুইস্ট নাচের অভ্যাসটা আর একবার ঝালিয়ে নিল। পরমেশ্বরের আহ্নিক মাথায় উঠল। নিজের ভাঙা ক্যাশবাকস খুলে একটা পোস্টকার্ড বের করে সঙ্গে সঙ্গে বহু দিনের ভুলে যাওয়া এক নিঃসঙ্গ আত্মীয়াকে বর্ধমানে চিঠি লিখতে বসলেন: কল্যাণীয়াসু, জীবনের বাকি কটা দিন তোর আটচালাতেই কাটাতে চাই। একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগে সেই রাতেই নিজের সব জিনিস প্যাক করে ফেললেন। সমস্যা হল দাড়ি কামাবার সেটটা

নিয়ে। ৩১ সালে সেটটা কিনেছিলেন হোয়াইটওয়ে লেডল থেকে। প্রথমে নিজেই কামাতেন। ৫৬ সালে বঙ্কিমের দাড়ি গজাবার পর সেও এই সেটে কামাত। বাড়িতে আর দ্বিতীয় কোন আয়োজন নেই। সেটটা ব্যাগে ভরে ফেললে সকালে বঙ্কিমের বিপদ হবে। কিন্তু রক্ত তখন তাঁর ফুটছে। এইরকম মানসিক অবস্থায় তিনি শঙ্করাচার্যের মোহমুদগর আওড়ান কা তব কান্তা কস্তে পুত্র। সেটটা ব্যাগে ভরে ফেললেন। বঙ্কিমের দাড় বঙ্কিম বুঝবে। বঙ্কিমের বউ বুঝবে। বঙ্কিমের জন্যে অনেক করেছেন। কলেজে ঢোকবার আগে পর্যন্ত নিজে হাতে কপাচে কপচে চুল কেটে দিয়েছেন চুলকাটার অবশ্য আব একটা গোপন কারণ ছিল বঙ্কিমকে যতদিন পর্যন্ত পারা যায় সেলুনে যাওয়া থেকে আটকে রাখা। প্রথমত পয়সা বাঁচবে, দ্বিতীয় নিজের খুশি মত ছোট বড় করে চুল ছেঁটে ঘাড়ের শাঁস বের করে চোখের সামনে নবকার্তিক হয়ে ঘুরবে না সব বেডি করে পরমেশ্বর এস্রাজ নিয়ে বসলেন। এইরকম মারাত্মক দিনে তিনি একটি গানই বাজান পর কি কখন হয় রে আপন, যতন করিলে পরই রয়

বঙ্কিম এই সুরের সঙ্গে পরিচিত। সাপ যেমন সাপুড়ের বাঁশির সুর চেনে। বঙ্কিম বউকে জিজ্ঞাসা করল, আজ কি খেল দেখিয়েছ? বউ বলল, ধেই ধেই করে নেচেছি। বঙ্কিম খুব অবাক হয়ে গেল—নেচেছ? তার মানে? তার মানে নেচেছি। কোথায় নেচেছ? বঙ্কিম এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, নার্ভাস হয়ে বসে পড়ল! বউ বলল, আজ অবশ্য এই ঘরেই নেচেছি, কাল ভাবছি দালানে নাচব। বঙ্কিম উঠে দাঁড়াল, কে তোমাকে নাচতে বলেছিল? নতুন বউ মাথা নাড়ল. কেউ বলেনি, সবাই এ বাড়ির নাচছে, আমিও নাচলুম। বঙ্কিম অবাক হল—সবাই নাচছে? বউ বলল. তোমার বাবা তো তাথৈ তাথৈ করে নাচছে।

আমার সঙ্গে কোন সময় মুখোমুখি হলে একেবারে ঝম্প নৃত্য। বঙ্কিম চিৎকার করে উঠল—শাট আপ।

বঙ্কিমের চিৎকার পরমেশ্বরের কানে গেল--জয় মা, পৌরুষ জাগছে, শের কা বাচ্চে। পরমেশ্বর তখন তক্তাপোশের উপর ছুম ছুম করে পায়ের তাল ঠুকে ঠুকে এস্রাজ জোরে জোরে বাজালেন, 'আপনার জন সতত আপন।' বঙ্কিম রেগেমেগে বেরিয়ে গেল! বঙ্কিমেরও রাগ হলে গঙ্গার ধারের বাঁধা বটতলাই গতি। চাঁদ উঠেছিল, হাতের আংটির জ্বলজ্বলে পাথরটার দিকে চোখ পড়ল। আংটিটা বিয়েব আগে তার বউ আদর করে হাতে পরিয়ে দিয়ে বঙ্কিমের সন্ন্যাসী হৃদয়ে প্রেমের তুফান তুলেছিল। বঙ্কিম সেদিন বউয়েব বুকে হাত দিয়ে, চুমু খেয়ে চবিত্র নষ্ট করেছিল।

বাবা বলতেন, বিবেকানন্দের মত চোখ চাই। বঙ্কিম ড্যাব ড্যাব করে আরশির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে নিজেব চোখে সেই চোখ খুঁজত। আঙটির দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমের রাগ জল হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল—টর্চার চেম্বার। ভদ্রলোক সারাটা জীবন কেবল অশান্তি করে গেলেন, অশান্তি ইজ ষ্টিজ লাইফ ব্রিদ।

পরমেশ্বরের অবশ্য বর্ধমান যাওয়া হল না। সারা রাত তিনি ব্যাপারটা ভাবলেন। বর্ধমানের সেই দুঃস্থা আত্মীয়ার বাড়িতে ভাল বাথরুম নেই, তাছাড়া জীবনে যাব খোঁজখবব কখনও করেননি সেখানে হঠাৎ যাওয়াটা কি ঠিক হবে! পরমেশ্বর এই প্রথম প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি ভাবতেও পারেন না সেদিনের মেয়ে, যার অন্নপ্রাশনে কাঁসার থালা দিয়ে পাত পেড়ে খেয়েছিলেন সেই মেয়ে কিনা তাঁকে কাবু করে দিলে। পবমেশ্বর পাশ ফিরে শুলেন। পরমেশ্বরের আর গৃহত্যাগ করা হল না। সকালে ব্যাগ থেকে শেভিংসেট বের করে

আলমারির মাথায় যথাস্থানে রেখে দিলেন। তারপর উদাস চোখে কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে রইলেন। বয়স যত বাড়ছে চোখের দৃষ্টিটাও যেন কেমন ঘোলাটে হয়ে আসছে। চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় জীবনীশক্তি কমে আসছে। পরমেশ্বরের চোখের দিকে তাকালে মানুষটার জন্যে বঙ্কিমের বুকটা কেমন করে ওঠে। সংসারে অ্যাডজাস্ট করতে পারলেন না বলে সারা জীবনই নিঃসঙ্গ। আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে। বন্ধু-বান্ধব নেই। কিছু আশ্রিতের উপর লাঠি ঘুরিয়ে আর প্রভুত্ব করেই জীবনটাকে পাথর বানালেন। চূর্ণ চূর্ণ হয়ে বালি হতে পারলে হয়ত কিছু পদচিহ্ন থেকে যেত। বঙ্কিম জানে এক সময় সে এই মানুষটির হৃদয়ের অনেকখানি জুড়ে ছিল। এখন পরের মেয়ে এসে তার অধিকার কায়েম করেছে। সেই ঝাপসা ভোরে পরমেশ্বর তাঁর ঘরেই বসে দেয়ালে ঝোলানো স্ত্রীর অস্পষ্ট ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই ছবি থেকে যেন তাঁর বিবেকের কণ্ঠ শুনতে পেলেন—তুমি অবহেলা করেছ, অত্যাচার করেছ, আমি এখন অনেক দূরে. আমার কোন দোষ নেই, আমি সংসার চেয়েছি, তুমি সংসার ভেঙেছ।

বঙ্কিম বোধহয় একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। ঘড়ির শব্দে চমকে উঠল। রাত এগারটা। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে খড় খড় করে কয়েকটা কুকুর দৌড়ে গেল। পরমেশ্বর মশারির ভিতর পা গুটিয়ে ধ্যানাসনে বসে বললেন—আর বসে থেকে কি করবি, যা শুয়ে পড়, ও আজও হতে পারে কালও হতে পারে। যাবার সময় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাস।

বঙ্কিম আলোটা নেবাতে গিয়ে একটু শক খেল। এটাও এ বাড়ির বৈশিষ্ট্য। সবই ডিফেকটিভ। মানুষ থেকে শুরু করে ফিটিংস, আসবাব-পত্র এমনকি উটকো বেড়ালটা পর্যন্ত। বঙ্কিমের ঘুম চটকে গেছে। রাস্তার দিকের বারান্দায় বেরিয়ে পরমেশ্বরের ঘরের বাইরে দরজার পাশে

হাঁটর উপর মাথা গুঁজে পিসিমাকে ঘুমোতে দেখল। বঙ্কিমের বড় মায়া হল। পরমেশ্বর রোজ শুতে যাবার পর এই ক্লান্ত পিসিমাকে পরমেশ্বরের কোমর আর পা টিপতে হয় যতক্ষণ না পরমেশ্বরের ঘুম আসে। ভদ্র-লোকের সায়টিকা আছে। টিপে না দিলে যন্ত্রণায় সারারাত ছটফট করেন। বঙ্কিম আঙুল দিয়ে পিসিমাকে একবার খোঁচা দিল। ভদ্র-মহিলা চমকে উঠেই জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে না মেয়ে। বঙ্কিম বলল, কোন খবর আসেনি। আজ যেন বঙ্কিম'স ডে। সারা বাড়িকে তাব কেবামতিতে একেবারে এটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। শ্যালক এসে স্ট্যাণ্ড এট ইজ করাবে। রেলিংয়ে ভর দিয়ে ছু' বাহু প্রসারিত পিচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে বঙ্কিম মনে মনে বলল, শালা আসছে না কেন!

বঙ্কিমের লজ্জা লজ্জা ভাবটা এতক্ষণে একটু কমে আসছে। বাবা হবে বেশ করবে, সব বিবাহিত লোকই বাবা হয়। পরমেশ্বরও হয়েছিলেন, সো হোয়াট। কি মুখখুমিই না সে করেছিল। যেদিন তার বউ এসে কথাটা বললে, সেদিন বঙ্কিমের মনে হয়েছিল সেই বুঝি অন্তঃ-সত্ত্বা হয়েছে। বাবা—বলে এমন একটা করুণ আর্তনাদ করেছিল। বউ বলেছিল, আমার ব্যাপার আমি বুঝবো। বঙ্কিম শোনেনি, সন্ধ্যে-বেলা বউকে বেপাড়ার ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যদি রক্ষা পাবার কোন রাস্তা বেরোয়। ডাক্তারবাবু একটু অবাক হয়ে বলেছিলেন. পাগল হয়েছেন, ফার্স্ট ইস্যু, মশাই, সেলিব্রেট করুন। বঙ্কিম ফি গুনে দিয়ে বউকে নিয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে এসে এক হোমিওর চেম্বারে ঢুকে-ছিল। ভদ্রলোক একটু বদমেজাজী। পরীক্ষা-টরীক্ষা করে বলেছিলেন, বেড়ে হয়েছে। বঙ্কিম তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না, বেড়ে হলে চলবে না, বাবা মেরে ফেলবেন। বৃদ্ধ ডাক্তার রেগে গিয়ে বলেছিলেন—

বিয়ে করা বউ তো, নাকি কুমারী. পরস্ত্রী ? বঙ্কিম একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধ বলেছিলেন, অতই যদি ভয় বাবা, একটা বাঁজা মেয়েছেলেব দার পরিগ্রহ করলেই পারতে। যাও যাও বয়স আছে, বছরে বছরে হোক। ওসব শ্লোগান-টোগানে কান দিও না। বাবার গলায় নাতি-নাতনীব মালা ঝুলিয়ে দাও, বুড়ো দেখবে সংসাবে মজে গেছে। বঙ্কিম শেষে অসহায়েব মত বলেছিল, আমাব কি হবে ? কি আর হবে ? দুধের টিন বগলে বাড়ি আসবে, রাঙা মশাবি, অয়েল ক্লথ, সুতো কাঁথা ভরপুর সংসাব জীবন, বাবাজী। বঙ্কিমেব ববাতে বাবা হওয়া ঝুলছে, কে খণ্ডাবে। না এলোপ্যাথি. না হোমিওপ্যাথি।

এখন বঙ্কিম ভাবে, কি ছেলেমানুষীই সে কবেছিল। নিজেব সন্তানকে হত্যা কবতে চেয়েছিল। এত বাত পর্যন্ত পরমেশ্বরের বসে থাকার কারণ বঙ্কিম জানে। বঙ্কিমের পিসিমা স্বপ্ন দেখেছেন, বঙ্কিমের দাদু ছেলে হয়ে ফিরে আসছেন। সেই ছ' ফুট লম্বা বিশাল চেহারার দাদু। যিনি একট পুরো কাঁঠালেব বস পাঁচপো দুধের ক্ষীরেব সঙ্গে মেড়ে খেতেন। যিনি একবার একটা কাবুলীকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিলেন। শেষ জীবনটা বঙ্কিমের বাড়িতেই কাটিয়ে গেছেন, কারণ সংসারে তিনিও বিশেষ সুবিধে করতে পাবেন নি। পরমেশ্ববের ঘরে ভাঙ্গা তানপুরায় রাম দত্তের গান গাইতেন তারস্বরে। আমার দিন যে আগত দেখি জগত জননী। গানে সুর ছিল না, ভাব ছিল। চোখে জলের ধারা নামত। পরমেশ্বরেরও অল্প বয়সে স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন, দাদুরও তাই। মাইলখানেক দূর থেকে সেই গান শোনা যেত। লোকে বলত, একটু পা চালিয়ে যাও বঙ্কিম, বাড়িতে আগুন লেগেছে, ফায়ার ব্রিগেড ডাকতে হতে পারে। সেই দাদু ফিরে আসছেন, ছোট্ট এতটুকু হয়ে। ভাবা যায় না। যাঁর এতখানি ভুঁড়ি ছিল। স্নানের সময় নাভিতেই পোয়া-

খানেক তেল খেত। মৃত্যুর পরে দাদুর কাঠের সিন্দুক থেকে সেরখানেক সিদ্ধি আর একটা খুলি বেরিয়েছিল। মাঝরাতে তন্ত্রসাধনা করতেন। বঙ্কিমের বউয়ের গর্ভে সেই যোগভ্রষ্ট তান্ত্রিক আবার ফিরে আসছেন।

মধ্যরাতের সেই নির্জন রাস্তায় ল্যামপোস্টের আলোতে একটা সাইকেলের হ্যাণ্ডেল চকচক করে উঠল। চলার কাঁপুনিতে বেলটা ঝিন ঝিন করছে। ওই আসছে বঙ্কিমের শ্যালক। অনেকটা ফিলমের হিরোর মত চেহারা। বঙ্কিম একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে পরমেশ্বরের ঘরে ঢুকল। অন্ধকার ঘরে ঝলঝলে মশারির মধ্যে ঝাপসা পরমেশ্বর তখনও ধ্যানাসনে খাড়া বসে। এত বয়সেও পরমেশ্বরের মেরুদণ্ড এতটুকু দোমড়ায়নি। সংসারে যিনি এত স্পষ্ট ছিলেন এখন কি অস্পষ্ট! অথচ কি ভীষণ ঋজু, সৈনিকের মত। বঙ্কিম বলল—আসছে। পরমেশ্বর প্রথমে কোন জবাব দিলেন না. তারপর বললেন, আলোটা জ্বাল। আলো জ্বালতে জ্বালতেই বঙ্কিমের শ্যালকের প্রবেশ। বঙ্কিমের চেয়ে বয়সে বছর খানেক বড। বঙ্কিমের ছেলেবেলার খেলার সাথী।

পরমেশ্বর মশারির বাইরে এলেন, কি খবর?

ছেলে হয়েছে, সাত পাউণ্ড ওজন।

নাভিটা দেখেছ? পরমেশ্বরের প্রশ্নে শ্যালক অবাক। লাল মত ছেলেটাকে সে নার্সের কোলে এক ঝলক দেখেছে। নাভিটা তো দেখা হয়নি। আর দেখবেই বা কি করে! সে জায়গাটা তো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। অথচ পরমেশ্বর সেই রাতের লক্ষণ মিলিয়ে নিতে চাইছেন। বঙ্কিমের দাদুর নাভির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেকটা পদ্মফুলের মত।

পরমেশ্বর প্রশ্ন করলেন, হাত-পাগুলো ঠিক আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক আছে, যেখানে যেমনটি থাকার ঠিক সেই-রকম আছে।

পরমেশ্বরের ধারণা ছিল, বোধ হয় ডিফেকটিভ মেশিন থেকে ডিফেকটিভ প্রোডাকশান বেরোবে।

টাইমটা অ্যাকুরেটলি নোট করেছো তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক দশটা পঞ্চান্ন।

সময় সম্পর্কে পরমেশ্বর সারা জীবনই সচেতন। বঙ্কিমের জন্মসময়ের ব্যাপারে ইদানীং তাঁর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কোষ্ঠী বলছে সন্ন্যাস যোগ, অথচ সেই সন্ন্যাসী এখন ফাদার হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে।

পরমেশ্বরের পরের প্রশ্ন একটু দ্বিধা জড়ানো, ছেলের মা? বউমা বলার চেষ্টা একবারই তিনি করেছিলেন, কিন্তু বউমার পরের খেলায় তিনি আর ঘৃণায় মা শব্দটা উচ্চারণ করেন নি। ওটা জগৎ মাতাকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

শ্যালক বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ ভাল আছে। প্রথমে তো গিয়েই ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারপর চেপে ধরে ডেলি—কথাটা আর শেষ করলেন না। পরমেশ্বরকে ভদ্রলোক ভয় পান। যে শব্দটা ব্যবহার করছেন সেটা শাস্ত্রসম্মত কিনা বুঝতে পারলেন না, শুধু বাংলাটাও মনে এল না। ফলে কথাটা ঝুলিয়ে দিলেন।

পরমেশ্বর মুখটা এমন করলেন, যেন বঙ্কিমের বউ যে ধরনের মেয়ে তাতে ইচ্ছে করলে রাস্তায় চলতে চলতেই ডেলিভারি করে ফেলতে পারে।

পরমেশ্বর বললেন, ডাক তোর পিসিমাকে। পিসিমাকে ঘরের বাইরে থেকে খুঁচিয়ে তোলা হল।

কি, ছেলে না, মেয়ে?

ছেলে।

বলেছিলুম ছোড়দা।

, পরমেশ্বর বললেন, ঠিক আছে, তুই বাজা, শাঁখ বাজা।

সেই ফুটো সিঁদুর মাখা শাঁখটা বেরোল। এই শাঁখ বাজিে বঙ্কিমকেও পৃথিবীতে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল, এক শীতের বিকেলে শাঁখটাব সবই ভাল, কেবল বাজাবার কৌশল এই পরিবাবের দু এ জনেরই জানা ছিল এবং সেই দক্ষ শিল্পীরা এখন সকলেই গতায়ু পিসিমা গাল ফুলিয়ে কয়েকবার ফুঁ ফাঁ করলেন। পবমেশ্বর খুব বিরক্ত, হিন্দুর মেয়ে শাঁখটাও বাজাতে পারিস না। ভায়ের সঙ্গে ত করার সাহস নেই। শাঁখটা কেউই বাজাতে পারে না। বঙ্কিম ছেলে বেলায় মুখেই শাখ বাজাত আর ফুটো শাঁখটা প্রথামত কারুর ঠোঁটে কাছে ধরা থাকত। বঙ্কিমের এখনও সেই টেকনিকটা লাগাবার ইচ্ছে হল ; কিন্তু সাহস হল না। বঙ্কিমেব ডাকাবুকো বউ অবশ্য এ সংসারে আসার পর একদিন চ্যালেঞ্জ কবে শাঁখটা বাজিয়েছিল ; কিন্তু তাকে এখন পাবে কোথায়' নিজের ছেলের জন্মের শাঁখ কোন মা কি বাজাতে পারে ?

পরমেশ্বর হাল ছেড়ে মশারির ভিতর ঢুকতে যাচ্ছিলেন, আর তখনই মধ্যরাতের নিস্তব্ধ জনপদকে সচকিত করে, প্রায় শখানেক বছরের প্রাচীন একটি বাড়ির এলোমেলো প্রকোষ্ঠে কেঁপে কেঁপে তিন বার শাঁখ বেজে উঠল। পরমেশ্বর মশারির ভিতর ঢুকতে ঢুকতে মনে মনে বললেন, তোমার শাঁখ তুমিই বাজাও।

জীবে দয়া

নবনীতা দেবসেন

মা টেরেসা নোবেল পুরস্কার পেয়ে অবধি দেশে জীবে দয়ার ট্রেনিং শুরু হয়েছে। আমাদের এক প্রতিবেশী সেদিন দেখলুম একজন ভিখিরিকে ডেকে এনে ছেঁড়া লুঙ্গি দিচ্ছেন। সেজপিসেমশাই একজোড়া আস্ত স্যানডাক চটি দিয়ে দিলেন রিকশাওলাকে (গত বছর এক বেচারী চোর ও বাড়িতে চুরি করতে ঢুকে, চটি জোড়া ফেলে পালিয়েছিল)। সতুবৌদি এক খাঁচা বদ্রীপাখি কিনে দিলেন ছেলেকে।—'যা দিনকাল পড়েছে, একটু মায়ামমতা প্র্যাকটিস করুক। প্রাইভেট টিউশন ছাড়া কিচ্ছুই তো শেখে না ছেলেপুলেরা, পাখিদের যত্ন করতে করতে যদি জীবে দয়া শেখে!'

জীবে দয়া করে যদি ক'লাখ টাকা ঘরে আসে, তো আসুক না, ক্ষতি কি? জীবে-দয়ার যে এতটা আর্নিং পোটেনশিয়ালস আছে তা কে আগে জানা ছিল? যেমন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার পরে কবিতার আর্নিং ক্যাপাসিটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা পালটে গেল, আর গাদা গাদা ইংরেজি কবিতা লেখা হতে লাগলো।

কিন্তু আমাদের বাড়ির ব্যাপার স্যাপার আলাদা। এ বাড়ি
প্রচণ্ড রকম জীবে দয়ার ট্র্যাডিশন—আমার মেয়েরা অষ্টবক্র মুনির ম
জীবে দয়ার ট্রেনিং সমেত ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাদের দয়ামায়ার অত্যাচা
বাড়িসুদ্ধ্ অতিষ্ঠ। কিছু বলতে গেলেই আমার মা বলেন, 'বো
এখন নিজে আমার কষ্টটা! মা যেমন, মেয়েরা তেমনিই হয়েছে
এর ফলে তাদের জীবে দয়া বাধাবন্ধহারা হয়ে আরও দিগ্বিদিকে ধাবি
হয়। দিকের চেয়ে বিদিকেই বেশি। ওদের বুকে জীবে দয়া য
বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসারের অশান্তিও চক্রবৃদ্ধি হারে বে
যাচ্ছে।—অথচ, মুশকিল এই যে, সংসারটাকে আমার কিছুতেই খ
সীরিয়াস ব্যাপার বলে মনে হয় না। মার সংসার ছিল আসল সংস
আমারটা যেন খেলাঘর। সেই বাড়িঘর, সেই মা, সেই আমি, এ
আমার মেয়েরা—এবং গাদা গাদা পুষ্যি (যেমন আমারও ছিল)—ন
কেবল বাবা। বাবা ছিলেন—মায়ের সংসারের মাথা ছিল। আমা
খেলার সংসারে কোনো মাথা নেই, তাই সংসার নিয়ে আমা
মাথাব্যথাও নেই। যেন রান্নাবাড়ি খেলছি—ঘরকন্নাটাকে কিছুতে
আমার বাস্তব বলে আর বিশ্বাস হতে চায় না। এ-সংসার যে
ভবসংসার—এর কাণ্ডারী সত্যি করে তিনিই, যিনি এই অখণ্ড মণ্ডলাকা
ব্রহ্মাণ্ডটিকে চালাচ্ছেন। আমার সংসারে আবাহনও নেই, বিসর্জন
নেই। আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা আছে দ্বার।

ছেলেবেলায় আমি যখন কানাখোঁড়া কুকুর, বেড়াল, ডানাভাঙা
পাখি, বাসা-ভাঙা কাঠবেড়ালী, কাকের ছানা, এমনকি চামচিকে পর্য

রে এনেছি—মা কখনো কখনো সইতেন, কখনো গুনিয়াভাইকে দিয়ে গারপারে ভাগিয়ে দিতেন। আমি পারি না। ফলে আমার সংসারে ীবজন্তু আসে, আসে, আসে। এবং থাকে, থাকে, থাকে। আমাদের াজেদের যত কৌটো চাল লাগে কুকুর বেড়ালদের চাল লাগে তার য়ে বেশি। নিজেরা মাছমাংস খাই না-খাই—কুকুরের হাড়, বেড়ালের াছ চাই-ই।

মা মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে বিদ্রোহ করেন। যখন অতিথিরা এসে ়িয়ে থাকেন, সবগুলো কৌচের গদিতে এক একটা আদুরে বেড়াল ায়া ফুলিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। ঠেললেও ওঠে না। 'এহ বাহ্য!' টুল, াড়া, মাদুর পেতে অতিথিদের বসাই। যাবার সময়ে তাঁদের অনেক য়ে খালি পায়ে যেতে হয়। জুতোগুলি এ বাড়ির কুকুর ইতিমধ্যে বিয়ে রেখেছে। কেউ কেউ খালি পায়ে যেতে রাজী হন না, আমাদের তো পায়ে দিয়ে যান। প্রত্যেকটি পর্দা, চাদর, টেবিলক্লথ চিবোনো, ল্লি ঝুলছে। প্রত্যেক চেয়ার টেবিল আলমারির পায়া চিবোনো বড়ো খেবড়ো। প্রত্যেকটি চেয়ারের সমস্ত চামড়ার গদি ছিন্নভিন্ন, লা বেরুনো—ওতে বেড়ালরা নখে শান দেয়। সর্বত্র ডুডোনিল লছে, প্রত্যেকটি ঘরেই তাজা, ফ্রেশ স্যানিটারি সুবাস। যেমন দামী াটেলের বাথরুমে। (নইলে মনে হবে চিড়িয়াখানা।)

মা দুঃখে হাসেন। হাসবেন না? তিনি যখন গিন্নি ছিলেন, খন সংসারে লক্ষ্মীশ্রী ছিল। জীবে দয়া করতে-করতে কী বাড়ি কী য় গেল। লণ্ডভণ্ড।

কিন্তু এহেন বাড়িতে আরো জীবে দয়া করা সম্ভব। সেই স্কোপ খনও আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? ঘটনাটা শুনুন, বিশ্বাস হবে।

'অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলছে। সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ রাস্তায় একট গণ্ডগোল। পড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠে মেয়েরা তো জানলায়। একটু পরে ছোট এসে বলল—'মা! মা! শিগগির এসো! একটা কুকুর ছানাকে না, (কী সু-ঈ-ট, ছো-ওট্টো, এখনও চোখই ফোটেনি ভালো করে) দুষ্টু ছেলেগুলো ঢিল মারছে, পা দিয়ে লাথি মেরে বল খেলছে এমন মাড়িয়ে দিয়েছে যে পেছনের দুটো পা কেমন লম্বা হয়ে গেছে' এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সাংসারিক ভূমিকা কী হওয়া উচিত ছিল কে জানে আমি তো আবাল্যের অভ্যেসে লাফিয়ে উঠেছি—'

—'কই? কই? কোথায়? চল্ তো দেখি—'।

'দিদি ওদের বকে দিয়েছে। ছেলেরা পালিয়ে গেছে।'

'আর কুকুরছানাটা?'

'দিদির কোলে।'

'আর দিদি?'

'গেটে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আনবে কি?'

মুহূর্তেই বুঝে ফেলি ব্যাপার। ঢোকেনি যখন, তখন নিশ্চয় সে গৃহপ্রবেশের যোগ্য নয়। সেবারে যখন কাকে-ঠুক্রে একচোখ গলে যাওয়া, পেছনের-পা-প্যারালাইজড্ বেড়ালছানাটাকে এনে ওরা শোবার ঘরে খাটে শুইয়ে পরিচর্যা করেছিল, আমার মা কুরুক্ষেত্র করেছিলেন এবারে তাই সাবধানতা নিয়েছে মেয়ে। মুহূর্তেই আমার কর্তব্য স্থির —'খবর্দার ভেতরে আনা হবে না। ওই সামনে, সদর উঠোনে যে কোণটায় একটু ঢাকামতন আছে, সেখানে রেখে দাও।' —'রাখি' থ্যাংকিউ! থ্যাংকিউ! মা, তুমি সত্যি খুব ভালো।' তারপরেই ছুটোছুটি। —'মা একটু দুধ? একটা সসার? বোরিক তুলো! ডেটল?'

আমি তো জীবনে মাকে থ্যাংকিউ বলেছি বলে মনে পড়ে না যদিও
স প্রশ্বাসে আমার মায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা। এরা বলছে, বলুক।
লতে বলতেই কৃতজ্ঞতা আসে হয়তো আজকাল।

রাত্রে খেতে বসে আলোচনা হচ্ছে দুই বোনে। দিদি বলছে—
কজেব দুধ দিসনি, একটু গরম করে দে, নইলে কিন্তু খাবে না।'

'একটু মাংসের স্ট দেব, দিদি? তুলোর পল্‌তেয় করে?'

'ও ভীষণ উইক, ঠিক কুকুরের মত ডাকতেও পাবে না মা,
ড়ালছানার মত ডাকে।'

'বেড়ালছানাই নয় তো? মা ফোড়ন কাটেন।'

'কী যে বল দিমা। আস্ত কুকুর। দিই স্টু?'

'পাগল!' বড়মেয়ে বলে, 'স্টু দেয় না। 'চোখই ফোটেনি, নুন
খাওয়ালে মরে যাবে। বরং এক ফোঁটা ভিটামিন ড্রপ দিতে পারিস।'

'খবর্দার এখন ভিটামিন দিস না।' মা হাঁ হাঁ করে ওঠেন—
'সর্বনাশ হবে, পেটের অসুখ করবে যে। সদর উঠোন একেবারে নষ্ট
করে ফেলবে।' তারপরেই যথানিয়মে—'আর তোমাকেও বলিহারি
যাই খুকু। মেয়ে দুটোকে কী নষ্টই করছিস। অ্যানুয়াল পরীক্ষার মধ্যে
পড়াশুনো ছেড়ে উঠে গিয়ে এসব নোংরা জিনিস ঘাঁটছে—ছি ছি!'—

'মাদার টেরেসা তো কুষ্ঠরুগী ঘাঁটেন।' বড় মেয়ে উত্তর দেয়।

ছোটমেয়ে সগর্বে বলে,—'দিদি তো বড় হয়ে মাদার টেরেসা হবে।
না দিদি।'

'আর তুমি? সিস্টার নিবেদিতা?'

'আমি? লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প!' এ বছরে ওদের টেক্সটে আছেন
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ঝুপ করে আলো নিবে গেল। সারমেয়জননী
ব্যাকুল।

'ওমা দশটা বেজে গেল যে? এক্ষুনি ওকে দুধ খাওয়াতে হবে। চার ঘণ্টা হয়ে গেছে।'

'হোক গে, অন্ধকারে নিচে যেতে হবে না।'

'অন্ধকার তো কী? আমি টর্চ ধরে থাকবো।'

লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প জবাব দেন। টেরেসা জুনিয়র দুধ, তুলো, টর্চ নিয়ে রেডি। শুশ্রূষাপার্টি লোডশেডিং উপেক্ষা করে সদরে বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন গেল চঞ্চলা আর লক্ষ্মী। যেন গায়ে হলুদের তত্ত্ব যাচ্ছে। ওরা যাচ্ছে পাহারাদার হয়ে। খোঁড়া কুকুরছানাকে কোলে তুলে অতি যত্নে দুধ খাইয়ে, ওপরে এসে ডেটলে হাতপা ধুয়ে, সে-পোশাক বদল করে, দুই দয়াবতী পড়তে বসলেন। মোমবাতি জ্বেলে। এগারটায় আলো ফিরবে।

আজকাল বাড়িতে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়া। অ্যানুয়াল পরীক্ষা বলে কথা। রাত্রে খাবার পরেও পড়তে বসা হয়। পৌনে বারোটার সময়ে মা তাড়া লাগাতে সুরু করেন—'বারোটা বেজে গেছে, উঠে পড়। আর পড়তে হবে না।' অবশেষে সাড়ে বারোটায় তাঁরা উঠলেন। উঠে ফ্রিজ খুললেন।

'মা, দুধ?' মা টেরেসার প্রশ্নের নম্র উত্তর দিই,—'আজ সকালে দু বোতল দুধ কেটে গেছে। যা ছিল তোমার দশটার ফীডেই খতম।'

'দুধ নেই? তা হলে কী খাবে ও?'

'কিছু ভাবিস না। ঠিক হয়ে যাবে।' বোনকে সান্ত্বনা দেয় দিদি। —'দেশলাই আছে? দীপুমামা?' ঘুমন্ত দীপুমামাকে ঠেলা মেরে জিজ্ঞেস করেন তিনি।

—'যা যা; ঝামেলা করিস না। এত রাত্তিরে দেশলাই দিয়ে কী হবে? কারেণ্ট এসে গেছে।'

—'গ্যাস জ্বালবো।'

—'গ্যাস?' দীপুমামার একটা চোখ খুলে যায়। 'কেন রে? চা হচ্ছে বুঝি?' দেশলাই বেরিয়ে পড়েছে বালিশের নিচে থেকে।

—'চা না। দিদি জল গরম করবে, নিউট্রামূল গুলবে।'

—'কে খাবে, নিউট্রামূল? এত গুডগার্ল কে হয়েছে?'

—'কেউ না। কুকুর ছানা।'

—'এই মাঝরাত্তিরে নিউট্রামূল খাবে ব্যাটা কুকুরছানা? দে আমার দেশলাই ফেরৎ দে।'

—'খিদে পায় না তার? সেই দশটায় খেয়েছে।'

—'ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবে নাকি? হোলনাইট প্রোগ্রাম? তার চেয়ে ওকে চা করে খাওয়া না বাপু? চাও খুব নিউট্রিশাস ড্রিংক। আমিও একটু খেতুম!'

—'দুধ নেই।'

'—যাব্বাবা।'

রাতবিরেতে গ্যাস জ্বেলে জল গরম হয়। কাচের গেলাসে প্রচণ্ড সিরিয়াসলি চামচ নেড়ে ঠনঠনাঠন্ মহাশব্দ করে পাড়া জাগিয়ে নিউট্রামূল তৈরি হতে থাকে। সব ঘরে আলো জ্বলছে। যেন বিয়েবাড়ি। সবাই সজাগ, কাজের লোকেরাই কেবল যা নিদ্রাবিহ্বল। দুই মেয়ের সেবাসুন্দর মাতৃমূর্তি দেখলেও চোখ জুড়োয়। মধ্যরাত্রে কী প্রবল ব্যস্ততা। দীপু মামা বলেছে. 'তুলোয় করে কত খাওয়াবি? ড্রপারে করে তাড়াতাড়ি খাবে।' তাই কালি ভরবার একমাত্র প্লাস্টিকের ড্রপারটি গরমজলে ধুয়ে ধুয়ে নিষ্কলুষ তথা স্টেরিলাইজ করা হচ্ছে। পরিষ্কার ড্রপারে টাটকা নিউট্রমুল নিয়ে হাতের উল্টোপিঠে ফোঁটা ফোঁটা ফেলে পরীক্ষা করা হচ্ছে, উষ্ণতা ঠিক সারমেয়শাবকের নরম জীবের

যোগ্য • কিনা। বড় মেয়েকে দেখে মনে হচ্ছে আঁতুড়ঘরের ডিউটিতে এক্সপার্ট নার্স। বোনটি একটু কম এক্সপার্ট। আয়া। ইন্‌স্ট্রাকশন ফলো করে সে দিদির।

—'চল্‌। সব রেডি ? পোশাকটা বদলেছিস তো ?'

—'কিন্তু এখন রাত্তিব একটা। এত রাত্রে আমরা একা একা সদরের উঠোনে বেরুবো ?' বোনের প্রশ্ন।

—'দীপুমামাকে ডাক।'

—'নো। নেভার।' দীপুমামা গর্জন করে। 'চা কববার বেলায় পারলি না। আমি যেতে পারব না। একা একাই যা। ওখানে জ্যোতিবাবুর পুলিশরা বেড়াচ্ছে। ওরা দেখবেখন।'

—'ঠিক আছে। চল্‌রে, আমরা যাই।'

—'কি হচ্ছে কি! তোমাদের মার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই ? কুকুরছানা না খেয়ে থাকে থাকুক।' হায়ার অথরিটি থেকে ইনজাংশন জারী হয়ে যায়।

—'দীপুমামা, প্লীজ ওঠো, মা যাবেন না, দিম্মা বকছেন—' অগত্যা দীপু ওঠে।—'হয়েছেও বাবা এক আজব বাড়ি। রাত্তির ছুটোর সময়ে, ছুটো বাচ্চা মেয়ের চোখে ঘুম নেই। কী ? না—রাস্তায় কুকুর খাওয়াবে! —চল্‌ চল্‌।' আর যাবে কোথায়! দীপুর গজগজানি থেকে শুরু হয়ে গেল মার লেকচার।—'খুকুরই আহ্লাদ দেবার কুফল এসব। তুমি ছেলেপুলে মানুষ করতে জানো না, খুকু।' আমি দুড়দাড় করে পালিয়ে যাই, যাবার আগে বন্যা'র মুখে খড়কুটো ধরার মতো আউড়ে নিই—'রাত্তির একটা বেজে গেছে, মা—এটা কি বকুনি দেবার সময় ?'

মাকে যুক্তিতে বাগ মানাবো তুচ্ছ আমি ? ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়েকে ?

—'যদি দুটো কচি মেয়ের পক্ষে, এই শীতের রাত্তিরে, মাথায় হিম ঝরিয়ে, সদর রাস্তায় হটর্ হটর্ করে বেরিয়ে গিয়ে পথের নেড়িকুকুরের রুগ্ন ছানা নিয়ে খেলাধুলো করবার পক্ষে সময়টা উপযুক্ত হয়, তাহলে তাদের গার্জেনকে বকবার পক্ষেই বা এটা সুসময় নয় কেন ?'

আমি বারান্দায় পালাই। উঁকি মেরে দেখি বড় মেয়ে পাঁচিলের ধারে বসেছে সিঁড়িতে। কুকুরছানা কোলে করে দুধের বদলে মধ্যরাত্রের অমূল্য ভালোবাসা গুলে, ড্রপারে করে খাওয়াচ্ছে। কোলে একটি ন্যাপকিন পেতে নিয়েছে। ওই ন্যাপকিনটা ফেলে দিতে হবে।

ছোট কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হুকুমের অপেক্ষায়। রকের ওপরে একটা সিগারেট জ্বলছে। অর্থাৎ দীপুমামাটি সেখানে। পাহারা দিচ্ছে আর জ্ঞানের বাণী উচ্চারণ করছে।

—'ওটার গায়ে গ্যামাক্সিন পাউডার দিয়েছিস তো ? দিসনি ? এবার দ্যাখ্ কি সর্বনাশ হয়। তোদের মাথায় রাস্তার কুকুরের পোকা চড়ে বসবে, সেই পোকা এসে উঠবে বাড়ির অন্য কুকুর বেড়ালের গায়ে। তখন ঠেলা বুঝবি।'

—'যা তো টুমপুস, সেভিন পাউডারটা নিয়ে আয়। প্লীজ। কী সর্বনাশ!'

—'কোথায় আছে ? এখন তো অনেক রাত্তির।'

—'এখন তবে থাক কাল সকালে দিলেই হবে।' দীপু বলে।

—'বাঃ! ততক্ষণে যদি আমাদের মাথায়—'

দীপুমামা ফের সলিউশান দেয়। —'ওপরে গিয়ে বরং তোরা মাথায় সেভিনপাউডার মেখে শো। সকালে শ্যাম্পু করে নিবি।'

—'সকালবেলায় তো পরীক্ষা। কখন মাথা ঘষবো।'

আমি বারান্দা থেকেই স্থানকাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠি—'খবর্দার!

সেভিন.দিবি না মাথায়। মানুষের মাথায় কখনো কুকুর বেড়ালের পোকা হয়? অ্যাদ্দিন জীবজন্তু পুষছিস, এও জানিস না?'

এমন সময়ে টহলরত দুটি পুলিশ এসে দাঁড়ায় পাঁচিলের পাশে। উঁকি দিয়ে দেখে এত রাত্রে কী অঘটন ঘটছে এ বাড়ির উঠোনে। কুকুরসেবা দেখে একজন পুলিশ সস্নেহে জিজ্ঞেস করে—'মর্ গিয়া?' ব্যাস্ দুই বোনে একসঙ্গে বকুনি লাগায়—'কিউঁ মরেগা? দুধ পীতা, দেখতা নেই?' ছোট যোগ করে দেয়—'ঠক ঠক্ করে কাঁপতা হ্যায়, দেখতা নেই?' পুলিশরা হেসে বলে যায়—'আবতক্ জিন্দা হ্যায়া? তাজ্জবকি বাত্!'

এমন সময়ে ছোট মেয়ে ওপরে মুখ তুলে বলে—'মা! একটা সোয়েটার দাও। শিগ্গির।'

—'কেন রে? শীত করছে?'

—'আমি না, কুকুরছানার জন্যে। ও শীতে কাঁপছে।' পেছন পেছন দীপুমামার ফোড়ন—

—'ও রাইগর জগতের কোনো সোয়েটারে থামাতে পারবে না। ও হল মরবার আগের কাঁপনি।'

গুম্ গুম্ করে কিলের শব্দ এবং দীপুমামার গলায় 'বাপ্রে মারে'। তারপরে দেখি মেয়ে ওপরে চলে এসেছে—হাতে নিজের ছোট্টবেলার একটা লাল-নীল সোয়েটার নিয়ে নেমে যাচ্ছে। ওরই পুতুলখেলার বস্তু। —'এটা নিচ্ছি?'

—'নে। কিন্তু সোয়েটার তো ওকে পরাতে পারবি না। ওর আসলে শীত করছে ঠাণ্ডা সিমেন্টের মেঝেয় শুয়ে আছে বলে।'

—'পাপোশটা নিয়ে নেবো তাহলে, গেট থেকে ?'

—'মোটেই নেবে না পাপোশ'—ও ঘর থেকে মা বাধা দেন। ফাইনাল গলায়। জীবে দয়ার কারণে বাড়িসুদ্ধু সবাই জাগ্রত। সব দরজা খোলা। সব আলো জ্বালা।

– 'তবে কী নেবো ?'

—'গোটা কয়েক স্টেটসম্যান আর আনন্দবাজার ভাঁজ করে বিছানা পেতে দে। দিব্যি গরম হবে।'

'—ওই সোয়েটার পরা কুকুরছানাটাকেই কাল ইস্কুলে পাঠিয়ে দিস খুকু তোর মেয়েদের পরীক্ষাগুলো দিয়ে-টিয়ে আসবে।' মা বলেন।

একটু পরে, ফের ডেটলে হাত-পা ধুয়ে, শোবার পোশাকে, কোলের কাছে শুয়ে বড়টি বললো—'কাল ওকে তুমি বন্দেল রোডের ভাল ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাবে, মা ? ওর পেছনের পা দুটোতে সেই বেড়ালছানার মতন প্যারালিসিস না হয়ে যায়—ভেঙেই গেছে মনে হচ্ছে।'

—'হবে হবে। এখন তো ঘুমো।'

সকালে উঠে নেজাল ড্রপের ড্রপারটা দিয়েই মেয়ের কলমে কালি ভরে দিলুম। পুনরায় সাড়ম্বর কুকুর-পরিচর্যার পর্ব সমাধা করে, তাঁরা পরীক্ষায় বেরুলেন। – 'জিওমেট্রি বক্স যে পড়ে রইল—'আমি পেছন পেছন ছুটি। নির্বিকারভাবে ফিরে এসে জিওমেট্রি বক্স নিয়ে ছুটতে ছুটতে জীবে দয়াবতী রিক্সায় ওঠেন গিয়ে। যেন এটাই নিয়ম।

—'আমি দেড়টায় এসে ফের খাওয়াবো !'

— দুগ্‌গা দুগ্‌গা। ভাল করে লিখিস।'

সেদিনই আমার ইউনিভারর্সিটি থেকে ফিরতে ফিরতে রাস্তার আলো জ্বলে গেল। বাড়ির সামনে এসে দেখি এক নাটকীয় দৃশ্য। পাঁচিলের ওপরে একটি দীর্ঘ মোম জ্বলছে। তার পাশে গেটে হেলান দিয়ে একজন, পাঁচিলে কনুই ভর রেখে একজন, মাথা নত করে অ্যাটেনশন হয়ে মিলিটারি কনডোলেন্সের স্টাইলে আর একজন—একটি মৌন মিছিল স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। দেখেই বুঝেছি কী হয়েছে। —দাপুই দৌড়ে আসে।

—'দিদি, সর্বনাশ হয়েছে। সেই ছানাটা—'

—'মরে গেছে তো? যাবেই, জানতুম।'

—ও কি? অমন করে বলতে হয়? বাচ্চাদের খুব মন খারাপ—'

—'মা, এখনই গাড়ি তুলো না। একটু গঙ্গার ধারে যেতে হবে' —বড় বলে।

—'কিংবা পার্ক স্ট্রীটের সেমেট্রিতে'—ছোট বলে।

আমি সিধে গাড়ি গ্যারাজে তুলে দিই।

—'ওকি? যাবে না?'

—ওই কুকুর নিয়ে? পেট্রল কে দেবে? উঠোনের সেই কোণটাতে গিয়ে দেখি সিঁড়ির ওপরে একটি জুতোর বাক্সে স্প্যানের কাগজ বিছিয়ে শবশয্যা প্রস্তুত। ছোট্ট কফিন। ফুলদানী থেকে তোলা রজনীগন্ধার মঞ্জরী তার পাশে আর চন্দনধূপ জ্বলছে। একগাদা খবরের কাগজের বুকে, মোমবাতির রহস্যময় মৃদু উদ্ভাসে, স্বয়ং একটি শোক সংবাদের মতো নিজেই নিজের অবিচুয়ারি হয়ে শুয়ে আছে ছোট্ট অতীব ক্ষুদে একটি প্রাণহীন প্রাণী। তার গায়ে আমার মেয়ের রংচঙে সোয়েটার। খুব মায়া হল। কিন্তু হতকুচ্ছিত। একেই ওরা বলছিল 'সুইট'? কেমন জামাই পছন্দ করে আনবে কে জানে? মোমবাতি,

ধূপ, ফুল, কফিন সব রইল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজগুলোর দুপাশে ধরে ট্রেচারের মতো তুলে ওকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে নামিয়ে দিলুম রাস্তায়, নর্দমাতে। ঠিক নাকবরাবর টুল পেতে বসে দুজন পুলিশ আমার কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করলেন : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গেটের বিপরীতেই এটা ঘটছে। মুদ্দোফরাসীতে মনে হোলো আমার এতই নৈপুণ্য যেন এই কর্মই করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনভর বুঝি মড়া ফেলতে ফেলতে রপ্ত হয়ে গেছে কাজটা।

ওপরে এসে গা ধুয়ে কাপড় বদলে চা খেতে বসেছি, মেয়ে বললে—'ও কি ওখানেই থাকবে?'

'তা কেন? ভোরবেলা জমাদার এলে নিয়ে যাবে। মন খারাপ করিস না, ও বাঁচতো না রে।'

—'বাঁচলেও তো হাঁটতে পারত না, সে ভীষণ কষ্টের বাঁচা হত। ছানাটা মরে বেঁচেছে।' মা সান্ত্বনা দেন। মেয়েরা কিছুই বলে না। চুপচাপ পড়তে বসে। ফের পরশুদিন পরীক্ষা। বেড়ালগুলো গিয়ে ওদের পড়ার বইয়ের ওপর চলে বসে। ওরা সরিয়ে দেয় না।

—'কই জমাদার তো নেয়নি, মা?'—সকালে উঠেই উঁকি মেরেছে।—'কিন্তু খবরের কাগজগুলো নেই।'

—'ঠিক চারটের সময়ে ঝাঁটার শব্দ পেয়েছি।' মা বলেন। 'খবরের কাগজগুলো তখনই নিয়ে গেছে নিশ্চয়।' যে-গেট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি বেরুবে, লালনীল সোয়েটার পরা কুকুরছানা নর্দমায় শুয়ে রইল তার সামনেই। যেন দোলনায় ঘুমুচ্ছে। —'এতগুলি গণ্যমান্য পুলিশের সামনেও ফেলে গেল?' 'ধন্যি পৌরকর্মী!'

—'দশটার আগেই ক্লিয়ার করে দেবে, ভাবিস না'—দীপুমামার টিপ্পনি। —'চীফ মিনিস্টার বেরবেন তো।'

দশটায় জ্যোতিবাবু যাত্রা করলেন। বাঁক মেরে দীপু বলল—

—'নেই। । নিয়ে গেছে। যা বলেছিলুম।'

—'নেয়নি। ওই তো, সরিয়ে রেখেছে কেবল—'

—'এই তো ফুটপাতে, ঘাসের ওপরে—'

—'এই তো আমাদের বাড়ির গায়েই—'

—'এই তো আমাদের গেটের ধারেই—'

—'কত মাছি এসেছে, ঈশশ।'

মাছি? শকুন নয় তো? যাক বাঁচা গেল। ঐ সোয়েটারের দৌলতেই কিনা জানি না—এখনো যে কাক চিল শকুনিরা টের পায়নি তবু রক্ষে।

ছোট বলে—'এখন কী হবে, ওখানেই থাকবে?'

বড় বলে—'তখনই বললুম গাড়ি তুলো না—শুনলে না তো—'

—'ছাখ, জীবে দয়া ভালো। কিন্তু আমিও তো একটা জীব? সারা দিনের শেষে ফেরবামাত্র ওপরে উঠতে দেবে না, মরা কুকুর কি সৎকার করতে নিয়ে যেতে হবে? ভোর থেকে উঠে তোমাদের খাবার তৈরি, জামা ইস্ত্রি, কলমে কালি ভরা, জিওমেট্রি বক্স নিয়ে পেছু পেছু ছোটা—আমাকে তোরা পেয়েছিস কী?'

বকুনি খেয়ে মেয়েরা করুণ মুখে চুপ করে থাকে। তখন আবার বলতে হয়—'দেখি ওই জুতোর বাক্সটা কোথায়? এখন তো তা হলে গাড়িটা বের করতেই হয়—'

'ওই কুকুরের বাসি মড়া কি এখন ফুলের মালা দিয়ে গাড়িতে তোলা হবে?' মা বলেন।

'তা ছাড়া আর উপায় কী?'

'উপায় করপোরেশনে খবর দেওয়া।'

মা আমার সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ। কত কিছু জানেন। রাস্তায় কুকুর মরে পড়ে থাকলে কী করতে হয় তা জগতে ক'জনে জানে? আমার মা জানেন।

—'দি করপোরেশন অফ ক্যালকাটা, হেলথ ডিপার্টমেন্ট ডিরেক্টরি খুঁজে বের করে নে। ঠিকানা দিয়ে বল, মুদ্দোফরাস পাঠাবে। অরডিনারি জমাদারে মড়া ফ্যালে না, ওদের ওটা কাজ নয়।'

খুব সোজা ব্যাপার। মাত্র সাতবারের চেষ্টাতেই টু-থি এক্সচেঞ্জ পাওয়া গেল। দুই মেয়ে হাঁটুতে চিবুক রেখে স্থির বসে আছে। উদ্বিগ্ন মাতৃমূর্তি। মা টেরেসা জুনিয়র। অ্যাণ্ড অ্যাসিস্টান্ট। অনেকক্ষণ ফোন বেজে গেল, বেজে গেল। তারপর একজন ধরলেন। মনে হল না, নামানুযায়ী ইনিই হেলথ অফিসার।

—'কুত্তা মর গয়া? কাঁহা? জ্যোতি বসুকা ঘরকা সামনে? কৌন জ্যোতি? ওহো, চীফ মিনিস্টর? ঠিক ঠিক আভী সাফাই হো জায়গা। ইয়ে সেণ্ট্রাল অফিস হ্যায়—আপ ডিস্ট্রিক 'ক' অফিসমে ফোন কীজিয়ে—ফাইভ সিক্স্।'

—'লিখেনে, লিখেনে, শিগগির—'

একমেয়ে কলম এগিয়ে দেয় অন্য মেয়ে হাতের পাতায় চটপট লিখে নেয়। ফাইভ সিক্স···

—'ডিস্ট্রিক 'ক' অফিস, টালা ব্রিজকো পাসমে বরানগর ও হী কিয়া হ্যায়।'

বরানগর কেন বলল? ভাবতে ভাবতে ফোন করি।

—'হ্যালো 'ক' হেলফ অফিস? আজ্ঞে চীফ মিনিস্টারের

বাড়ির সামনে একটা কুকুর ছানা কাল থেকে মরে পড়ে আছে।

—'তা এখানে কেন ? জ্যোতিবাবু কি এখানে থাকেন ? বরানগর তাঁর কনস্টিট্যুয়েন্সি, তাঁর রেসিডেন্স নয়। এও জানেন না ? এমন লোক এখনো আছে এ শহরে ?'

—'আজ্ঞে ? তা তো জানিই—আমি তাঁর বাড়ির সামনে থেকেই বলছি তো। হিন্দুস্থান পার্ক থেকে।'

—'তা এখানে কেন ? এটা তো কাশীপুর—'

—'কিন্তু আমাকে তো করপোরেশন থেকে এই নম্বরই…'

—'আঃ হা—তাতে কি হয়েছে ? মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় ভুল করেছে। আপনি ফোন করুন ডিস্ট্রিক্ট 'খ'তে। ফোর টু… এটা ভুল পাড়া। বুঝেছেন তো ?'

—'লিখে নে, লিখে নে, ফোর টু...ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। খুব বুঝেছি

—'হ্যালো ! ফোর টু… ?'

—'হ্যাঁ, বলুন।'

—'চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনে একটা মরা কুকুর ছানা পড়ে আছে। দয়া করে যদি—'

—'চীফ মিনিস্টারের বাড়ি ? অর্থাৎ হিন্দুস্থান পার্কে ? ওখানে কুকুর ছানা মরেছে ?'

—'ভীষণ মাছি উড়ছে—হেলথ হ্যাজাড…'

—'বুঝেছি বুঝেছি। খুব মুশকিলের কথা। কিন্তু এটা তো ডিস্ট্রিক্ট 'খ'র অফিস। আমরা কী করতে পারি, বলুন ?'

—'আজ্ঞে দয়া করে যদি একটু সরিয়ে নেন—'

—'তা তো বুঝছি, মুশকিলটা কী জানেন, আপনারা তো আমাদের অফিসের আনডারে পড়েন না ?'

—'পড়ি না ? আমরা ডিস্ট্রিক্ট 'খ' নই ? তবে আমরা কী ?'

—'উদ্বেগের কিছু নেই। আপনি বরং ডিষ্ট্রিক্ট 'গ'র অফিসে, ফোর ফাইভ ··এ ফোন করুন। ওরা পারবে।'

(লিখে নে! লিখে নে! ফোর ফাইভ...মেয়ের হাতের ক্ষুদে চেটো উপচে পড়ে এখন কনুইয়ের কাছাকাছি লেখা হচ্ছে ফোন নম্বরের তালিকা।)

—'ফোর ফাইভ···এ ফোন করব তো ?'

—'হ্যাঁ। করে ডি সি ওকে চাইবেন। শুনুন, শুনচেন, যাকে-তাকে বললে দেরী হবে, সোজা ডি সি ওকে চাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কিছু মনে করবেন না এটা তো ভুল অফিস—মানে, আপনারা ভুল এরিয়া—বুঝেছেন।'

—'থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। লিখে নে, ডি সি ও—বুঝেছি, আমরা ভুল এরিয়া।'

—'হ্যালো! ফোর ফাইভ··· ? ডিষ্ট্রিক্ট 'গ'র হেলথ অফিস ?'

—'ইয়েস।'

—'সি ডি ও আছেন ? সি ডি ও ?

—'কে ? কাকে চাইছেন ?'

(নেপথ্যে এদিকে মেয়েদের চীৎকার)—

—'সি ডি ও নয় মা! সি ডি:ও নয়! ডি সি ও। বল, ডি সি ও। ওই যে, লেখা আছে—'

—'স্যরি। সি ডি ও নয়, ডি সি ও! ডি সি ও! উনি আছেন ? ডি সি ও ?'

(নেপথ্যে ফোনের ভেতরে আকুল প্রশ্নোত্তর শোনা যায়।)

ডি সি ওকে চাইছে। কী বলব ? আছে, না নেই ?'

—'আমি কি জানি? দেখে আয়। থাকলে বলবি আছে, না থাকলে বলবি নেই।'

—'এই রকম বলব ত?'

—'আবার অন্য রকম কী বলবি? তুই সত্যি যাচ্ছেতাই—
ইতিমধ্যে আর একজন ফোন ধরলেন—'হ্যালো। কাকে চা আপনার?'

'ডি সি ওকে।'

—'কেন? কী দরকার?'

—চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনের উল্টোদিকের ফুটপাতে একটা কুকুরছানা মরে পড়ে আছে।'

—'অ। তা আমাকে বলে কি হবে? ডি সি ওকে বলুন।'

—'তাঁকেই তো চাইছিলুম।'

—'একটু ধরুন—'

—'হ্যালো! হ্যালো! শুনচেন?'

—'আবার কী হলো?'

—'আচ্ছা, ডি সি ও মানে কী, বলতে পারেন?'

—'তাও জানেন না? আচ্ছা লোক তো? ডিষ্ট্রিক্ট কনজারভেটা অফিসার। ডি সি ও। বুঝেছেন? আপনারা ওসব বুঝবেন না এই নিন কথা বলুন।'

—'দাঁড়ান দাঁড়ান, কজারভেটরি? না কনজারভেন্সি?'

—'ফের ঝামেলা? ওই একই হলো। ধরুন—'

—'হ্যালো! ডি সি ও বলছেন? নমস্কার। নমস্কার। আমি বলছি হিন্দুস্থান পার্ক থেকে।' (তখন চীফ মিনিস্টার ইত্যাদি...)

—'ওঃ। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে কুকুরছানা মরেছে

ঠিক আছে। কিছু ভাববেন না। এক ঘণ্টার মধ্যে ক্লিয়ার করিয়ে দিচ্ছি।'

—'ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।'

—'কী আশ্চর্য, ধন্যবাদের কি আছে। এ তো আমাদের ডিউটি। এখুনি লোক যাচ্ছে।'

ফোন নামাতেই মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পডলো।

—'কেন তুমি সি ডি ও বলছিলে?'

—'কিসের ইনিশিয়ালস তা না জানলে আমার অমন অক্ষর মনে থাকে না—বি ডি ও এস ডি ও-র মতই সি ডি ও বলেছি। বেশ করেছি।'

—'ওরা তোমাকে কী ভাবলো?'

—'আমাকে চেনেই না। তা ছাড়া আমি মরলে তো ওদের খবর দিলে চলবে না, হিন্দু সৎকার সমিতির নম্বরটা ফোনের খাতায় লিখে রেখে যাবো। যাও তো এক কাপ চা করে আনো দেখি। বাপস রে! এর থেকে গাড়িতে নিয়ে গেলেই হতো।'

—'বলেছিলুম তো। এই বেলা বারোটায় চা?'

—'কেন? রাত দুটোয় নিউট্রামূল তৈরি করতে পারো—'

—'রাত দুটো নয়। একটা।' ছোট মেয়ে শুধরে দেয়।

—'আর অসময়ে খাওয়াবাব ফলটাও তো চোখে দেখলে!' বড় মেয়ে মন্তব্য করে।

—'তোমাদের যত এনার্জি সব জীবজন্তুদের বেলায়—আমি কিছু বললে হাত পা নড়ে না—'

— ছি ছি মা তুমি কুকুরছানাটাকে হিংসে করছো?'

—'তা করছি। আমি যখন বুড়ো হবো, তখন তোমাদের এই যত্নগুলো কোথায় চলে যাবে কে জানে?'

—'দিম্মা তো বুড়ো হয়েছেন। তোমার মনটা কি কোথাও চলে গেছে? এতক্ষণ ফোন করল কে?

এমন সময় ওপর থেকে মার গলা পেলুম—'খুকু! মেয়েদের নিয়ে ওপরে আয় দিকিনি এই মুহূর্তে। মুসম্বির রসগুলো পড়ে পড়ে তেতো হতে লাগলো—বেলা বারোটা বাজে! ভোর থেকে কেবল একটা মরা কুকুর নিয়ে নেত্য করছিস। আমি তো একটা বুড়ো মানুষ আমার প্রতি কি তোদের দয়ামায়া হয় না রে?'

হুড়মুড়িয়ে ওপরে ছুটি পাল্লা দিয়ে তিনজনে—মা ক্ষেপে গেলে সর্বনাশ, জীবে দয়া বেরিয়ে যাবে প্রত্যেকের।

আসান

সমরেশ মজুমদার

মেট্রোর নীচে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে মানুষ দেখল সুবীর। এখন দুপুরবেলা। অথচ জায়গাটা জমজমাট হয়ে আছে। ম্যাটিনী শো আরম্ভ হতে সামান্য দেরী, যাদেব টিকট আছে হনহন করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ওর খেয়াল হল প্রচুর লোক একদম বিনা কারণেই চুপচাপ এখানে দাঁড়িয়ে। ওরা কি সবাই কারো জন্য অপেক্ষা করছে? এত লোক? এই একটা ব্যাপার সুবীর কিছুতেই বুঝতে পারে না। এখন দুপুরবেলা, যে কোন বয়স্ক মানুষ অফিস কাছারিতে যাবে অথবা ব্যবসায় ঘুরবে। কিন্তু ঠিক এই সময় সুস্থ স্বাস্থ্যবান পুরুষগুলো রেষ্টুরেণ্টে, সিনেমা হাউসের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কি করে? বেশবাস দেখে কাউকেই বেকার অথবা দরিদ্র মনে হয় না, তাহলে এদের চলে কি করে? ঘড়ি দেখল সুবীর, সামনে ট্রাম ডিপোর ঘড়ির সঙ্গে পাঁচ মিনিটের তফাৎ; স্লো যাচ্ছে বড্ড।

একটু আগে নীরেনদার অফিস থেকে ঘুরে এসেছে সে। কিন্তু নীরেনদাও নিরাশ করল। মাসের শেষ, হাত একদম খালি এই সব বলে

কাটিয়ে দিল। সুবীর এমনিতে মুখচোরা মানুষ, বন্ধুবান্ধব কম। অথচ ওর আজই আড়াইশো টাকা দরকার। অনেক হিসেব করেছে সে, ওর কমে হতে পারে না। এখান থেকে বোম্বাই যাতায়াতেই তো দেড়শো টাকা বেরিয়ে যাবে, তারপর তিন দিনের খাওয়া খরচ হোটেলে থাকা এই সবের জন্য অন্তত একশ টাকা হাতে রাখা দরকার। ওর টিউশনির টাকাগুলো পেতে অন্তত দিন দশেক দেরী, অ্যাডভান্স চাইলে গাঁইগুঁই করবে। তাছাড়া সেটা বোম্বাইতে খরচ করে এলে সামনের মাসটা চলবে কি করে? মেসের মালিক মুখ দেখে থাকতে দেবে না। প্রায় দু'বছর দরখাস্ত করে যাবার পর এই প্রথম একটা ইন্টারভিউ পেল সুবীর। বোম্বাইয়ের একটা ইংরেজী কাগজের কপি রাইটার। হবে না হয়তো, নিশ্চয়ই ভেতরের লোক ঠিক করা আছে, তবু হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করছে না সুযোগটা। প্রথম ইন্টারভিউ, দিয়েই দেখা যাক না। এই এ্যাদ্দিন ধরে পটুয়াটোলার একটা প্রেসে দুপুরে প্রুফ দেখে আর কপি লিখে কাটাল, তার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। ওদের কলেজের ইংরেজির প্রফেসর ডি. জি. এ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে সুপারিশ পত্র দিয়েছিলেন। ডি. জি-র বন্ধু ওই কাগজের চিফ নিউজ এডিটর। বলা যায় না, হলেও হতে পারে চাকরিটা। কিন্তু তার জন্য ওকে বোম্বাই যেতে হবে এবং যেতে হলে টাকা চাই। একবার ভাবল, এখনো পকেটে গোটা কুড়ি টাকা আছে, স্বচ্ছন্দে বালুরঘাট চলে যাওয়া যায়। গিয়ে দাদার কাছ থেকে যদি চেয়েচিন্তে নিয়ে আসতে পারে তাহলে তো হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল সুবীর। না, আজ অবধি দাদার সংসারে সে কিছুই দিতে পারেনি, চাকরি যদি না হয় তাহলে বউদির মুখ চিরকালের জন্য খোলা থাকবে।

তার চেয়ে টিউশনির টাকাটা আগাম চাওয়া ভালো। সঙ্গে সঙ্গে

মনে হল একবার ডি. জি-র বাড়িতে যাব নাকি! ইন্টারভিউ লেটারটা পকেটেই আছে, গিয়ে দেখিয়ে অবস্থা খুলে বললে ডি. জি. নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। কলেজে সে ডি. জি-র খুব প্রিয় ছাত্র ছিল। ব্যাপারটা একদিন আগেও সে কল্পনা করতে পারত না, কিন্তু যখন আড়ষ্ট পায়ে সুবীর মেট্রোব তলা ছেড়ে গ্রাণ্ডের দিকে হাঁটতে লাগল। ডি. জি-র বাড়ি ল্যান্সডাউনে, হেঁটে গেলে নিশ্চয়ই বিকেল হয়ে যাবে, ওঁকে পাওয়া যাবে।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল সুবীর। সদর স্ট্রিটটা পার হতেই শুনল কে যেন কাকে চেঁচিয়ে ডাকছে। খেয়াল করল না সে, একটু এগোতেই শব্দ করে একটা গাড়ি একদম ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল

হ্যালো কোমল, এই যে এদিকে, ওঃ, কোমল ?

সুবীর দেখল একজন মহিলা ট্যাক্সির পিছনেব সিটে বসে ওর দিকে তাকিয়ে ডাকছেন। ভীষণ অবাক হল সে। আশে পাশে এখন কেউ নেই, এই রোদ্দুরে কেউ কাজ ছাড়া এ পথে হাঁটে না। মহিলা ওকে হাত নেড়ে কাছে ডাকছেন। কিন্তু ওর নাম তো কোমল নয়। নিশ্চয়ই ভুল করছেন মহিলা।

ইতস্তত করে ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেল সে। বয়স হয়েছে মহিলার, তবে সিনেমায় দেখা মেয়েদের মতন সেটা শুধু চারপাশে ঠোকর মারছে, ভেতরে ঢুকতে পাবেনি। একটু স্থূল চেহারা, তবে গায়ের রঙে এবং চোখের চাহনিতে একদা-সৌন্দর্য আণ্ডারলাইন করা। কাছাকাছি হতেই সুবীর শুনতে পেল, ওঃ, তখন থেকে ডাকছি তোমার কানেই যাচ্ছে না কোমল ? না কি ইচ্ছে করেই এ্যাভয়েড করছ! ইউ আর টু নটি!

আপনি আমায় বলছেন ? সুবীর আমতা আমতা করল।

ইজ ইট সো! কপালে কয়েকটা ভাঁজ ফেলে মহিলা হেসে উঠলেন,

চালাকি, না! বলে দরজা খুলে নীচে নেমে সুবীরের হাত ধরলেন—উঠে পড় তো গাড়িতে। সেই কবে থেকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি এখন ঢং করা হচ্ছে।

হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল সুবীর—আপনি ভুল করছেন, আমি—আমি—মানে আমি আপনাকে চিনি না। আপনি অন্য কারোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন!

সেম ট্যাক্‌টিক্স। আরে বাবা, আমরা কি বাঘ না সিংহ যে তোমাকে খেয়ে ফেলব! সেই যে আসবে বলে পালালে আর দেখা নেই। আচ্ছা, মিথ্যে ঠিকানা দেবার কি দরকার ছিল? ওঠ ওঠ কোন কথা শুনতে চাই না।

প্রায় জোর করে ওকে ভেতরে ঠেলে দিলেন মহিলা। দু-একজন পথ চল্‌তি লোক দৃশ্যটা দেখে বেশ মজা পাচ্ছিল। ট্যাক্সিওয়ালা দাঁত বের করে হাসছে। যেন সত্যিই সুবীর মহিলাকে ইচ্ছে করে চিনতে পারছে না। দূরে একটা পুলিশ ভ্যানকে এদিকে আসতে দেখল সে। ততক্ষণে মহিলা উঠে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, চলিয়ে সর্দারজী রিচি রোড।

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল সুবীরের। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে ও কি করবে বুঝতে পারছিল না। ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করতেই ও বলল, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে কখনো দেখিনি।

আমাকে বাচ্চা ছেলে পেয়েছ—এ রকম একটা মুখভঙ্গী করলেন মহিলা—ঠিক এই কথা তুমি ভার্মাকেও বলেছিলে। বেচারা বিশ্বাস করেছিল।

ভার্মা? ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল সুবীর।

সেই যে খুব মোটা মহিলা, যার স্বামী বম্বে মিরর-এর ডিরেক্টর।

আচ্ছা, আমরা কি করেছি বল তো ? এমন করছ কেন কোমল ?

কোমল ! খুব ঘাবড়ে গেল সুবীর। কিন্তু একটু আগে সে কি শুনল ! বোম্বে মিরর ! ওই কাগজেই তো তার ইন্টারভিউ। ভার্মা বলে ইনি যার কথা বলছেন তার স্বামী ওখানকার ডিরেক্টর। কিন্তু কোমল কি রকম নাম ?

কি ভাবছ কোমল ? ভাগ্যিস মিসেস চোপরা এখন কলকাতায় নেই, নইলে তোমাকে উনি ছিঁড়ে খেতেন। মহিলা হাসলেন।

গাড়ি তখন সার্কুলার রোডে পড়েছে। ঢোঁক গিলে সুবীর বলল, কেন ?

বাঃ তুমি ওঁকে ব্লাফ দিয়ে আমাদের কাছে হেকৃড করলে না। ওঃ, তখন রোজ ক্লাবে এসে মিসেস চোপরা তোমার কি প্রশংসা করতেন। শুনে তো ভার্মা আর থাকতেই পারল না, বলল একদিন আলাপ করিয়ে দাও। তোমার কালেকশনের এলেম দেখি। কিছুতেই রাজী হন না মিসেস চোপরা। হাতছাড়া হবার ভয় গো।—বলে খিল খিল করে হেসে উঠলেন মহিলা।

কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না সুবীর। কোন রকম বলল, তারপর ?

তারপর ? কিছুই জানো না যেন, একদিন আমি ঠিক দুপুরবেলা ওঁর ফ্ল্যাটে চলে গেলাম। একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, দেখি তুমি বেরুচ্ছ। সেদিন যে শনিবার খেয়াল ছিল না, মিস্টার চোপরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন যে। মিসেস চোপরা আলাপ করিয়ে দিতে তুমি পড়ি মরি করে কাটলে ! একটু রোগা হয়েছ তুমি, কিন্তু তোমার ফিগার একই রকম আছে। লিণ্ডসে ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে তোমায় দেখেই আমি চমকে উঠেছি। আরে, সেই কোমল না ? কিন্তু মিসেস চোপরার

কাছ থেকে তুমি পালালে কেন? আমাদের ক্লাবের চারজন তোমার জন্য ঠায় সারা দুপুর বসে ছিলাম। তারপর ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, জানি, চোপরাটা ভীষণ কিপ্‌টে, টাকা পয়সা দিচ্ছিল না নিশ্চয়ই?

মিষ্টি অচেনা একটা গন্ধে নিশ্বাস ভারী হয়ে গেল সুবীরের। টাকা পয়সা? এঁদের সঙ্গে সেই কোমল ছোকরাটার সম্পর্ক কি ছিল!

ও এবার হাসল—আপনি কিন্তু এখনও ভুল করছেন।

ওঃ নটি! মিস্টার চোপরা জানতে পেরে গিয়েছিলেন, না? সেটাই আমাদের সন্দেহ। আরে বাবা তাতে কি হয়েছে, আমরা তো ছিলাম, ও ভাবে ডুব মারতে হয়। মহিলা এমন ভাবে ওর বাঁ হাতের বাইসেপে হাত রাখলেন যে সুবীর চমকে উঠল। ওর শরীর শান্ত হয়ে যেতেই মহিলা খুশি হলেন—গুড। আমার আবার কাঠখোট্টা মাস্‌লওয়ালা লোক একদম ভালো লাগে না।

মোটামুটি একটা অনুমান করতে চেষ্টা করছে সুবীর। কোমল নামের কেউ এই মহিলার বান্ধবীর সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল। এঁরা তার মধ্যে নাক গলাতেই সে কেটে পড়ে। কিন্তু সম্পর্কটা কি? আর, একবার কয়েক মিনিটের দেখাটাই মহিলার আজকের ভুলকে সাহায্য করেছে।

গাড়ি রিচি রোডের একটা মাল্‌টি-স্টোরিড বিল্ডিং-এর সামনে থামতেই মহিলা ভাড়া মেটালেন। একটা কাগজের প্যাকেট নামিয়ে সুবীরের হাতে ধরিয়ে বললেন, নাও, মহিলাদের কিছু বহন করতে দিতে নেই, জানো না?

কৌতূহল হচ্ছিল না তা নয় কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও হচ্ছিল। ওর মন বলছিল ব্যাপারটা ভালো নয়। খামোকা একটা বিপদে জড়িয়ে

পড়া ঠিক হবে না। কিন্তু মহিলার ভঙ্গীটা তাকে আশ্বস্ত করছে না। এখন যদি ও দৌড় লাগায় তাহলে কি উনি চেঁচাবেন? তাছাড়া, ওর বোম্বে মিরর শব্দ দুটো মনে পড়ল। কোম্পানির ডিরেক্টর যদি সুপারিশ করে তাহলে কি চাকরি না হওয়ার কোন চান্স থাকে। ও ঠিক করল মহিলাকে ঠাণ্ডা মাথায় ভুলটা বুঝিয়ে বলবে তারপর চাকরির কথা বলবে। হঠাৎ কিছু করে বসা একদম বোকামী হবে।

ওরা ছ'তলায় লিফ্ট থেকে নামল। বাঁদিকেই একশো আট নম্বর দরজার ওপর নেমপ্লেট, তাতে শুধু 'রয়' লেখা। মহিলা কলিং বেল টিপতেই ভেতরে কোকিল ডেকে উঠল। একটি বাচ্চা মেয়ে এসে দরজা খুলল। মহিলা ওকে ভেতরে আসতে বললেন। লম্বা সিটিং রুম। সুন্দর সোফা সেট, একদিকে সাদা গোল কাঠের রেলিং তাতে মানি-প্ল্যাণ্ট ঝুলছে।

ও মা, বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন! মহিলা ওর হাত ধরে বসিয়ে দিলেন। দু'দিকে দুটো ঘরের দরজা, তাতে ময়ুর আঁকা ভারী পর্দা ঝুলছে। মহিলা ওর হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে বাচ্চাটাকে বললেন, কি রে, লোডসেডিং হয়নি তো! উঃ, কলকাতার যা অবস্থা, ভদ্রলোক থাকতে পারে না। কি খাবে, চা না কফি?…কিছু না, তাহলে একটা কোল্ড কিছু বলি! এই, একদম না না করবে না। আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।

কথাটা শেষ করেই উনি ঘরের কোনায় দ্রুত পায়ে চলে গেলেন। সেখানে একটা ক্যাবিনেটের ওপর সাদা টেলিফোন রয়েছে। মহিলা ডায়াল করতে করতে বাচ্চাটাকে কাছে ডাকলেন—তোর কাজ হয়ে গিয়েছে? গুড। যা, চলে যা। কাল ভোর ভোর আসিস বাবা।

বাচ্চাটা যেন এমন হঠাৎ মুক্তি পাবে ভাবতে পারেনি। একগাল হেসে দরজার দিকে দৌড়াল।

ততক্ষণে মহিলা কথা বলছেন, কে—ভার্মা? কি করছ? আরে হ্যাণ্ড ইওর গুড ফুল। কি—কাল বোম্বাই যাচ্ছে? যাক না। শোন, একটা দারুণ খবর আছে। না না, বলব না, চলে এসো, সারপ্রাইজ দেব। আসছ? গুড। দেখলে তো, আমি চোপরার মতো স্বার্থপর নই। না না, কিছু বলব না।

এক ঝলক হেসে টেলিফোন নামিয়েই আবার ডায়েল করলেন—'হু ইজ স্পিকিং? ও—মিসেস আগরওয়ালা হ্যায়? ও হো, রুক্সি, দিস ইজ রয়, জলদি চলা আও। আরে বাবা জব্বর সারপ্রাইজ দেব। না এলে পরে আমাকে গালাগালি করতে পারবে না বলে দিলাম। ভার্মাও আসছে। গুড।

টেলিফোন নামিয়ে কোমরে হাত রেখে হাসলেন রয়—ব্যাস। সবাইকে খবর দিয়ে দিলাম। আমরা তিনজন তোমার এলেম দেখব।

সুবীরের বুকের ভেতরে এখন হাতুড়ি পড়ছে, ও উঠে দাঁড়াল—দেখুন, আমি একটা কথা বলল? আমি এখানে—!

ওকে থামিয়ে দিলেন মহিলা—কিছু ঘাবড়াবার দরকার নেই। মিস্টার রায় এখন প্যাসিফিকে ভাসছেন। বছরে ছ'মাসের ছুটিতে আসেন। অতএব এখানে তোমায় কেউ কিছু বলবে না। বড্ড গরম, একটু স্নান করে নেবে?

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল সুবীর—না না, স্নান করব না।

সে কি! ঘেমে নেয়ে গেছ তো? মহিলা এগিয়ে এসে ওর বুকে হাত রেখে ঘাম পরখ করলেন।

সুবীর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালো। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল মহিলার কাছে ক্ষমা চেয়ে এখান থেকে যাবার অনুমতি নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও বলে বসল, আমাকে কি করতে হবে?

তোমাকে? খিলখিল করে হেসে উঠলেন রয়—তোমাকে আমরা দেখব। এই যে, এখানটায় একটা বড় আলো আছে, এর তলায় দাঁড়িয়ে আমাদের যোগাসন শেখাবে।

যোগাসন? ফ্যালফেলে গলায় বলল সুবীর।

আঃ, ন্যাকামো কোরো না তো। মিসেস চোপরা আট পাউণ্ড পর্যন্ত ওজন কমিয়ে ছিলেন তোমাকে পেয়ে। এখন আবার যে কে সেই, আসলে যোগের যে সব ট্রেনিং সেণ্টার আছে সেখানে যেতে পারতাম আমরা, কিন্তু এত অল্পবয়সী আর লোয়ার মিডল ক্লাশ ছেলেমেয়ে ভীড় করে না, যেতে অস্বস্তি হয়। যাও, যাও স্নান করে নাও। বলে মহিলা ওকে টানতে টানতে বাথরুমের দিকে নিয়ে চললেন।

শেষবার চেষ্টা করল সুবীর—আমি কিন্তু এখনও বলছি, আপনি ভুল করছেন। আমি কস্মিনকালেও যোগাসন জানি না।

রয় ঠোঁট কামড়ালেন—চল, তোমাকে স্নান করিয়ে দি।

সঙ্গে সঙ্গে 'না না' বলে দরজা বন্ধ করল সুবীর। কি করা যায়! বোঝাই যাচ্ছে কয়েকজন বিগতযৌবনা মহিলা যোগের মাধ্যমে স্লিম হবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ওরা ইচ্ছে করলে সে রকম সেণ্টার থেকে ট্রেইনার হায়ার করে আনতে পারে তো। সেই কোমল বলে ছোকরাটা কি ভাঁওতা দিয়েছিল কে জানে!

ওদের মেসের ঘরের চেয়ে বড় বাথরুমটা। ডানদিকে বিরাট বাথটাবে টৈটুম্বুর জল। ওপরের চেম্বারে নানান্ রকমের সাবান শ্যাম্পু এবং ক্রীম। দুটো দুধরঙা তোয়ালে ঝুলছে হ্যাঙারে। এ রকম স্নানের ঘরে সে জীবনে ঢোকেনি। জলে হাত দিয়ে সুবীর লোভী হয়ে উঠল। ওদের মেসের রেশন করা জলে স্নান করে এখানকার বাথটাবে শোওয়ার লোভ সামলাতে পারল না। স্নান

করতে করতে ও ঠিক করল কিছুতেই সে যোগাসন দেখাবে না। স্পষ্ট বলে দেবে এ সব কিছুই সে জানে না এবং সে কোমল নয়; সুবীর। দরকার হলে পকেট থেকে ইন্টারভিউ লেটারটা বের করে নিজের পরিচয়ের প্রমাণ দেবে।

ঠিক সেই সময় ওপাশে শব্দ হল। সুবীর চমকে উঠে হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিল। যে দরজা দিয়ে সে ঢুকেছিল সেটা ভেতর থেকে বন্ধ করা, কিন্তু এপাশে যে আর একটা দরজা আছে তা লক্ষ্য করেনি। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেল। রয় মুখ বাড়ালেন - তোমার হয়ে গিয়েছে?

লজ্জা এবং অস্বস্তি কাটাতে সুবীর ঘাড় নাড়ল।

ওরা এসে গিয়েছেন। মহিলা ঘোষণা করলেন।

আমি যাব না, যেতে পারব না। সুবীর জামাপ্যান্টের দিকে হাত বাড়াল।

কেন?

আমি সুবীর, কোমল নই।

জানি। তবে সুবীর তোমার নাম জানি না। তুমি কোমলের প্রক্সি দাও।

ভীষণ অবাক হল সুবীর—মানে?

ওরা এসে গেছে, আমার মুখ রাখ। আমি চোপরাকে জব্দ করতে চাই।

কিন্তু আমি কি করে পারব?

কেন পারবে না? তোমার বয়স তো তিরিশের নীচে, স্বাস্থ্যও ভালো। তাদের কাছে আমার সম্মান রাখলে আমি তোমার ব্যবস্থা করব।

এতে সম্মান অসম্মানের কি আছে ?

বাঃ, চোপরা ভালো ছেলে ধরতে পারে কিন্তু দেখাতে পারে না, ওর সে হৃদয় নেই। আমার আছে—এটাই আমার সম্মান।

আপনি সব জেনে শুনে আমাকে এনেছেন ?

কোমলের চেহারা আমার মনে নেই।

আমি এখন কি করি !

কিছু না ! ঐ ঘরে যাবে, হাসবে, ওরা তোমার শরীর টিপে দেখবে তুমি দেখতে দেবে। ব্যস, তার বেশী কারো ক্ষমতা নেই। শেষ-মেষ দু'-একটা সহজ আসন যা সবাই জানে তাই করতে বোলো, দেখবে হাস্যকর চেষ্টা করে ওরা কেটে পড়বে। আমি জিতে যাব।

হঠাৎ সুবীরের বম্বে মিরর-এর কথা মনে পড়ে গেল—ভার্মাকে দিয়ে আমার একটা উপকার করবেন ?

কি ?

বোম্বে মিরর-এ একটা ইণ্টারভিউ পেয়েছি আমি। চাকরিটা যাতে হয় একটু বলে দেবেন ?

খিলখিল করে হাসলেন মহিলা—তার জন্যে চিন্তা নেই, বউয়ের চেয়ে আমার কথা ভার্মা বেশী শুনবে। এসো।

মহিলার পিছন পিছন সুবীর সিটিং রুমে ফিরে এলো। মহিলা তখন ওর সঙ্গে গেস্টদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন—নাউ লেডিজ, ইউ উইল মিট মোস্ট ইণ্টারেস্টিং বয় অফ ক্যালক্যাটা—হু রিফ্যুজড্ টু স্টে উইথ আওয়ার ফ্রেণ্ড চোপরা।

হাঁ হয়ে গেল সুবীর। দুজন বৃদ্ধা মহিলা ফোকলা দাঁতে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। দুজনই ভীষণ মোটা, মুখ কাঁধের ওপর আটকানো এবং মাথার চুল পেকে উঠে যাচ্ছে। ওঁরা সোফা থেকে উঠে থলথলে

পায়ে ওর দু'পাশে এসে দাঁড়ালেন। নরম কাঁপা আঙুল দিয়ে ওর হাতের বাইসেপ টিপে দেখলেন। সুবীরের মনে হল এক ঝটকায় দূরে সরে যায়। এই দুই বৃদ্ধার বিকৃত বাসনার খিদে মেটানোর চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়।

ঠিক এই সময় বাইরে কেউ কলিং বেলে হাত দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাটময় অনেকগুলো কোকিল ডেকে উঠল। খুব হতাশ ভঙ্গী করে রয় এগিয়ে এলেন, সরি, আমার মেয়ে বোধ হয় স্কুল থেকে ফিরে এলো।

ভার্মা মাথা নেড়ে বললেন, ডিলিসিয়াস!

আগরওয়ালা সুবীরের কোমরে হাত রেখে বললেন, আমাকে এমন করে দেবে ভাই? আমি টেন থাউসেণ্ড দেব—

ভার্মা বললেন, ফিফটিন—

আগরওয়ালা বললেন, টুয়েন্টি। বলে বুকের ভেতর থেকে একটা পার্স খুলে দুটো একশো টাকার নোট ওর হাতে গুঁজে দিলেন এ্যাডভান্স।

তাই দেখে ভার্মা ব্যাগ হাঁতড়ালেন, তারপর সেখান থেকে টাকা বের করে সুবীরের অন্য হাতে গুঁজে দিলেন—রয়, এতে আমার ঠিকানা দিয়ে দাও, আমি রোজ দুপুরে আলাদা ভাবে এর কাছে ট্রেনিং নেব।

আগরওয়ালা বললেন, তাহলে সন্ধ্যার জন্য আমার ঠিকানাটা দিয়ে দিও।

রয় দরজা খুললেন। ফুটফুটে দেখতে বছর দশেকের একটি মেয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকেই ওদের দেখে দাঁড়িয়ে গেল! সুবীরের দু'হাতের মুঠোয় টাকা, সে কি করবে বুঝতে পারছিল না। মেয়েটি অবাক চোখে ওকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, হু ইজ হি মাম্?

রয় বললেন, একজন ইয়ং ম্যান সোনা

খুব সুন্দর দেখতে, না মাম্ ?

হ্যাঁ সোনা।

ওর হাতে টাকা কেন মাম্ ?

পারিশ্রমিক নিয়েছে সোনা।

তুমি কি দেবে মাম্ ?

সুপারিশ, সোনা